বিদেশী ঘাটির সন্ধানে
রোমেনা আফাজ

দস্যু বনহুর সিরিজ

বিদেশী ঘাটির সন্ধানে-৬৩

রোমেনা আফাজ

সালমা বুক ডিপো
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

ডাঃ রায় আপনিই যে হত্যাযজ্ঞের নায়ক এ কথা কেউ ভাবতেও পারেনি। কথাটা গম্ভীর কঠিন কণ্ঠে বললেন মিঃ জাফরী।

মিঃ হারুন যেন বোবা বনে গেছে। সে ডাঃ রায়কে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতো এবং বিশ্বাস করতো। আজ সেই বিশ্বাসী প্রধান ব্যক্তিটাকে লোমশ আলখেল্লা পরা অবস্থায় খুনির যন্ত্রপাতি হাতে দেখে সে যেন একেবারে থ'মেরে গেছে।

ডাঃ রায় এর মুখখানা পাংশু বর্ণ ধারণ করেছে। এমন পরাজয় আসবে তার জীবনে তিনি ভাবতেও পারেননি। ডাঃ রায় রাগে দুঃখে অধর দংশন করছেন। এই শীতের রাতেও তাঁর সমস্ত শরীর ঘেমে নেয়ে উঠছে।

মিঃ জাফরীর সঙ্গে যারা এখানে উপস্থিত রয়েছেন তারা সবাই বিস্মিত হতবাক হয়ে গেছেন। কেউ ভাবতে পারেননি যে ডাঃ রায় এই হত্যাকান্ডের অধিশ্বর। তাঁর হাত দু'খানা পিছমোড়া করে বাঁধা হয়েছে। তাঁর লোমশ আলখেল্লাটা খসে পড়ে আছে পায়ের কাছে।

মিঃ ফেরদৌস উঁবু হয়ে আলখেল্লার ভিতর থেকে দুটো অদ্ভুত ধরনের যন্ত্র বের করে নিলো। যন্ত্র দুটি হাতে নিয়ে সে সোজা-হয়ে দাঁড়ালো তারপর বলতে শুরু করলো—আপনারা হয়তো কিছুটা অনুমান করেছেন এই দুটি যন্ত্র দ্বারা খুনী তার কার্যোদ্ধার করতো। এই যে আমার বাম হাতে যে যন্ত্র বা অস্ত্রটি দেখছেন এটা দিয়ে মানুষকে হত্যা করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে শিকারের দেহ থেকে এই যন্ত্র দ্বারা রক্ত শোষণ করে নেওযা হয়। এ যন্ত্রের কাজ এতো দ্রুত যে কয়েক মিনিটেই শিকারের দেহ থেকে সমস্ত রক্ত এই যন্ত্রের মধ্যে চলে আসে। আর আমার ডান হাতে যে যন্ত্রটি দেখছেন আপনারা সেটি হলো শিকারের মাথা থেকে অতি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তার চোখ দুটি তুলে নেওয়া হয়। এই যন্ত্রের কাজ অতি সূক্ষ্ম, যে চোখ দুটি শিকারের মাথা থেকে তুলে নেওয়া হয় তার কোন শিরা-উপশিরা বিনষ্ট হয় না। এই চোখ এবং এই রক্ত এই দুটি যন্ত্রের মধ্যেই সজীব থাকে। হাঁ, তারপর ঐ যে টেবিলে যে অদ্ভুত ধরনের বাক্স দেখছেন ঐ বাক্সে এই চোখ ও রক্ত জমা রাখা হয়। এ বাক্সগুলির নাম আই ব্যাঙ্ক আর ব্লাড ব্যাঙ্ক। এই সব বাক্সে দু'মাস পর্যন্ত রক্ত আর চোখগুলো তাজা থাকে।

মিঃ ইলিয়াস বলে উঠলেন—আশ্চর্য!

হাঁ আশ্চর্যই বটে।

মিঃ জাফরী পূর্বের ন্যায় গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—কিন্তু আপনি কি করে এই হত্যা রহস্যের মূল স্তম্ভের সন্ধান পেলেন মিঃ ফেরদৌস?

হাঁ, সে কথাই এখন বলবো, আপনারা যখন ডক্টর হিন্ময়কে সন্দেহ করে তার পিছনে ধাওয়া করেছেন তার বহু পূর্ব হতেই আমি ডাঃ রায়কে সন্দেহ করে এসেছি এবং তখন থেকেই তাকে আমি ফলো করে আসছি।

ডাঃ রায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাকিয়ে আছেন মিঃ ফেরদৌস-এর দিকে। দু'চোখে তার যেন আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে।

মিঃ ফেরদৌস ঠিক্ ডাঃ রায় এর পাশে দাঁড়িয়ে কথাগুলো বলছিলো, আবার বলতে শুরু করলো সে—মিঃ জাফরী, আপনার হয়তো মনে আছে এক গভীর রাতে আপনি ডাঃ রায়-এর ল্যাবরেটরিতে গিয়েছিলেন কোন প্রয়োজনে। তার ল্যাবরেটরিতে পৌঁছে আপনি যা দেখলেন তা অতি বিস্ময়কর। কারণ ডাঃ রায় তখন একটি অদ্ভুত মানুষের সঙ্গে মোকাবেলা করছিলেন। আপনি দেখলেন লোমশদেহি আলখেল্লা পরিহিত এক ব্যক্তি এবং আপনি মনোযোগ সহকারে শুনলেন তার কথা-বার্তা। ডাঃ রায়কে আপনি কোনোদিন সন্দেহ করেননি বা করতে পারেননি। সেদিন আপনি আরও নিশ্চিন্ত হলেন ডাঃ রায় সম্বন্ধে।

হাঁ, আমি ঠিক্ ঐ প্রশ্নই আপনাকে করতে যাচ্ছিলাম মিঃ ফেরদৌস। কারণ ঐ রাতে আমি ডাঃ রায়-এর ল্যাবরেটরিতে পৌঁছে যা দেখেছিলাম এবং শুনেছিলাম তা থেকে বোঝা যায় ডাঃ রায় ছাড়াও আরও এক ব্যক্তি আছে যে লোমশ দেহি মানুষ। কথাগুলো বলে থামলেন মিঃ জাফরী।

মিঃ ফেরদৌস বললো—যে লোমশদেহি আলখেল্লা পরিহিত ব্যক্তিকে আপনি সেদিন ডাঃ রায়-এর ল্যাবরেটরিতে দেখেছেন সে লোমশদেহি অন্য কেহ নয় আমি......

কক্ষ মধ্যে যেন বাজ পড়লো, সকলেই বিস্ময় নিয়ে তাকালেন মিঃ ফেরদৌসের মুখে।

এমনকি ডাঃ রায় পর্যন্ত চমকে উঠলেন অকস্মাৎ চাবুক খাওয়া আহত ব্যক্তির মত। আঁতকে উঠে তাকালেন, তার দৃষ্টিতে ঝরে পড়লো একরাশ প্রশ্ন। কিন্তু তিনি কোন কথা বললেন না।

মিঃ ফেরদৌস বলেই চললো—আমি জানতে পারি ডাঃ রায় এই হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে চলেছেন কিন্তু ব্যাপারটা একেবারে সত্য কিনা জানার জন্যই আমি নিজে তারই ছদ্মবেশে তারই ল্যাবরেটরিতে যাই। তার মুখের ভাবেই আমি বুঝতে পারি তিনি এই হত্যাযজ্ঞের নায়ক কিনা। কারণ ডাঃ রায় তাঁর নিজস্ব অদ্ভুত ড্রেসে অপর এক ব্যক্তিকে দেখে শুধু ঘাবড়েই যাননি, একেবারে হতভম্ব হয়ে পড়েছিলেন। ঐ মুহূর্তে যদি মিঃ জাফরী গিয়ে

না পৌঁছতেন তাহলে আমি ঐ দিনই তাঁর কাছ থেকে তার হত্যা রহস্যের মূল মন্ত্র আবিষ্কার করে নিতাম। যাক তবু আমি সে দিন যতটুকু জানতে পেরেছিলাম সেইটুকুই আমার পক্ষে যথেষ্ট ছিলো।

থামলো মিঃ ফেরদৌস, মুখমণ্ডল তার দীপ্ত উজ্জ্বল। আবার বলতে শুরু করলো সে—কেউ কিছু বুঝতে না পারলেও ডাঃ রায়-এর মনে সেদিনের ব্যাপার ভীষণভাবে রেখাপাত করলো। তিনি সর্বক্ষণ এ ব্যাপার নিয়ে ভাবতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর হত্যা লীলা সমানভাবে চললো। ডক্টর হিন্ময়কে পুলিশ মহল যাতে সন্দেহ করে সে জন্য ডাঃ রায়-এর প্রচেষ্টা কম ছিলোনা। ফেরদৌস সবার মুখে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললো—আপনারাও তাকেই সন্দেহ করছিলেন অবশ্য আমি নিজেও এ ব্যাপারে আপনাদের সঙ্গে একমত হয়ে গিয়েছিলাম।

মিঃ জাফরী এবং তার দল-বল বিস্ময় নিয়ে শুনে যাচ্ছিলেন। বলে উঠেন পুলিশ সুপার মিঃ আহম্মদ আলী—আপনি কি করে এখানে এলেন এবং ডাঃ রায়-এর এই গোপন ল্যাবরেটরিতে সন্ধান পেলেন জানতে চাই মিঃ ফেরদৌস?

একটু হেসে বললো মিঃ ফেরদৌস—আমি জানতাম প্রতি রাতে ডাঃ রায় তাঁর হত্যা সাধনা চালিয়েই চলেছেন। এ কারণে প্রতি রাতে তার একটি করে শিকারের প্রয়োজন। আমি এই সুযোগ নিলাম। ডাঃ রায় আমাকে একদিন গভীর রাতে তার গোপন ল্যাবরেটরিতে আসার জন্য অনুরোধ জানালেন। তিনি বললেন—সেই লোমশদেহিকে যদি আপনি স্বচক্ষে দেখতে চান তবে ঐ স্থানে আসবেন। আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করবো...... এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমি কেনো এখানে এসেছিলাম এবং এখানে পৌঁছেই আমি মিঃ জাফরীর কাছে ফোন করেছিলাম।

মিঃ জাফরী এবার বললেন—হ্যাঁ, আপনি আমাকে সেই রকম জানিয়ে ছিলেন। মিঃ ফেরদৌস, আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। ডাঃ রায় যে এই হত্যাকান্ডের নায়ক আমরা এতোদিন তাঁর সঙ্গে একত্রে কাটিয়েও বুঝতে পারিনি। আপনি সুকৌশলে তা বুঝে নিয়েছিলেন এবং তাকে কৌশলে বন্দী করতে সক্ষম হলেন কিন্তু আর একটি প্রশ্ন করবো?

করুন। হাঁ, আপনার প্রশ্নটা কি হবে অবশ্য আমি জানি তার পূর্বে আরও একটি কথা আপনাদের জানা দরকার।

সবাই স্থির নয়নে তাকালেন মিঃ ফেরদৌসের মুখের দিকে।

মিঃ ফেরদৌস বলে চলে—আপনাদের স্মরণ আছে বিখ্যাত গোয়েন্দা শঙ্কর রাও আজ দু'সপ্তাহ হলো নিখোঁজ আছেন।

মিঃ হারুন বলে উঠেন—হাঁ, তিনি কি সত্যিই নিহত হয়েছেন।

না, তিনি নিহত হননি! বললো ফেরদৌস।
এক সঙ্গে প্রায় সবাই বলে উঠেন—মিঃ শঙ্কর রাও জীবিত আছেন।
হাঁ।
মিঃ ইলিয়াস বললেন—ডাঃ রায় তাকে আজও জীবিত রেখেছেন?
ডাঃ রায় নয় মিঃ শঙ্কর রাওকে আমিই সরিয়ে রেখেছি......
মিঃ ফেরদৌসের কথায় মিঃ জাফরী বিস্ময় ভরা কণ্ঠে বললেন— আপনিই মিঃ শঙ্কর রাওকে—
হাঁ, আমিই তাকে সরিয়ে রেখেছি, কারণ শঙ্কর রাও আমার কাজে বাধা স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তাই বাধ্য হয়ে তাকে আটক রেখেছি।
তিনি জীবিত সুস্থ আছেন তাহলে? বললো মিঃ হারুন।
তিনি জীবিত এবং সুস্থ আছেন। কালকেই তিনি আপনাদের মধ্যে ফিরে আসবেন। ডাঃ রায়, আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন কারণ আমি আপনার কাজে আপনার সাধনায় বাধা দিলাম। মিঃ জাফরী এবং আমার অন্যান্য বন্ধুগণ, আপনাদের সঙ্গেও আমাকে অনেক সময় অনেক রকম ছলনা করতে হয়েছে সেজন্য আমি লজ্জিত—দুঃখিত—মিঃ ফেরদৌস-এর কথা শেষ হয় না।
মিঃ জাফরী তার পাশে এসে দাঁড়ায় তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বলেন—আজ কান্দাই হত্যা রহস্যই শুধু সমাধান হলোনা মিঃ ফেরদৌস, তার সঙ্গে সঙ্গে দস্যু বনহুরকেও আমরা গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হলাম....কথা শেষ করেই মিঃ জাফরী তাঁর রিভলভার মিঃ ফেরদৌসের বুকে চেপে ধরলেন এবং তাঁর সহকারীদের লক্ষ্য করে ঈংগিৎ করলেন। তাদের অস্ত্র নিয়ে মিঃ ফেরদৌসকে ঘিরে ফেলার জন্য।
তৎক্ষণাৎ আদেশ পালন করলো মিঃ জাফরীর সঙ্গীগণ, নিজ নিজ অস্ত্র বাগিয়ে ফেরদৌসকে ঘিরে দাঁড়ালো তারা।
মিঃ ফেরদৌসের মুখে কিন্তু কোন ভাবান্তর পরিলক্ষিত হলোনা।
কক্ষ মধ্যে সকলেরই চোখে মুখে রাশিকৃত বিস্ময় ছড়িয়ে পড়েছে। মিঃ ফেরদৌস স্বয়ং দস্যু বনহুর এ যেন তারা ভাবতেই পারছেন না।
এমন কি ডাঃ রায়-এর চোখেও বিস্ময় ঝরে পড়ছে। তিনি মিঃ ফেরদৌসকে এতোদিন একজন সাধারণ গোয়েন্দা বলেই জানতেন, আজ তার বন্দী অবস্থায় একি শুনলেন। স্বয়ং দস্যু বনহুর তাকে এমনভাবে পরাজিত করলো।
মিঃ ফেরদৌসকে যখন মিঃ জাফরী ও তার দল অস্ত্র নিয়ে ঘিরে ফেলেছে তখন মিঃ ফেরদৌস হঠাৎ হেসে উঠলো অদ্ভুতভাবে, তারপর হাসি থামিয়ে বললো—আমি ঠিক জানতাম আপনি আমায় চিনতে পেরেছেন কারণ

কান্দাই শহরে একমাত্র আপনার চোখকেই আমি ফাঁকি দিতে পারিনি। আরও জানতাম হত্যা রহস্য উদ্ঘাটন হবার পর পরই আপনি আমাকে গ্রেপ্তার করতে ইচ্ছুক হবেন। কিন্তু দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করা যত সহজ মনে করেছেন তত সহজ নয়......

কথা শেষ না করেই মিঃ ফেরদৌস বেশী দস্যু বনহুর একটি বোম জাতীয় বল মাটিতে নিক্ষেপ করে, সঙ্গে সঙ্গে একরাশ ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত কক্ষটার মধ্যে।

মুহূর্ত বিলম্ব না করে মিঃ জাফরী তার রিভলভার থেকে গুলি ছোড়ে এবং সবাইকে গুলি ছোড়ার জন্য আদেশ দেন কিন্তু আশ্চর্য কোন রিভলভার থেকে গুলি বের হয় না।

অজস্র ধোঁয়ার মধ্যে শোনা যায় বনহুরের হাসির শব্দ—হাঃ হাঃ হাঃ—হাঃ হাঃ হাঃ।

জমাট ধূম্র রাশির মধ্যে দিশেহারা হয়ে পড়লেন কয়েকজন জাঁদরেল পুলিশ অফিসার।

অবশ্য কয়েক মিনিটের মধ্যেই ধূম্ররাশি কমে এলো। কক্ষমধ্যে সবকিছু স্পষ্ট এবং পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

মিঃ জাফরী এবং তার দলবল চোখ রগড়ে তাকালেন, দেখলেন ডাঃ রায় দাঁড়িয়ে আছেন, মিঃ ফেরদৌস কক্ষমধ্যে নাই।

প্রত্যেকটি পুলিশ অফিসারের মুখ পাংশু বর্ণ ধারণ করলো। তারা দস্যু বনহুরকে হাতে পেয়েও পাকড়াও করতে সক্ষম হলেন না এটা তাদের চরম পরাজয়।

মিঃ জাফরীর মুখমণ্ডল কালো হয়ে উঠলো। তিনি রাগে ক্ষোভে অধর দংশন করতে লাগলেন। শুধু ক্রুদ্ধই হলেন না তিনি একেবারে যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। তাদের আগ্নেয় অস্ত্রগুলিও আজ সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে পড়লো কি করে। দস্যু বনহুর যখন অট্টহাসিতে ভেংগে পড়লো তখন মিঃ জাফরী স্বয়ং গুলি ছুড়েছিলেন এবং তার সঙ্গীরাও গুলি ছুড়েছেন কিন্তু একটি গুলিও তাঁদের রিভলভার থেকে বের হয়নি।

ধুম্ররাশি কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ অফিসারগণ নিজ নিজ আগ্নেয় অস্ত্র খুলে ফেলে দেখলেন, তাদের অস্ত্রে কোন গুলি ভরা ছিল না। বিস্ময়ে হতবাক হলেন মিঃ জাফরী ও তাঁর দলবল কারণ তারা তাঁদের রিভলভারে গুলি ভরেই রেখেছিলেন। ঐ মুহূর্তে তাদের রিভলভার কি করে গুলি শূন্য হলো ভেবে পেলেন না।

যেন সব যাদু বিদ্যার মত মনে হলো তাঁদের কাছে। কিন্তু ভেবে আর কি হবে মিঃ জাফরী এবার ডাঃ রায়কে বন্দী অবস্থায় গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে কান্দাই পুলিশ অফিসে এলেন।

সমস্ত শহরে কান্দাই হত্যা রহস্যের অবসান ব্যাপার নিয়ে নানারকম গুজব ছড়িয়ে পড়লো। সংবাদ পত্র গুলিতে এই হত্যা রহস্যের অবসান নিয়ে গত রাতের ঘটনাটি বিভিন্ন আকারে প্রকাশ পেলো।

ডাঃ রায় যে এই হত্যা রহস্যের নায়ক একথা যখন কান্দাই বাসীদের ঘরে ঘরে পৌঁছলো তখন সবাই ছুটলো এই অদ্ভুত রহস্যপূর্ণ ডাক্তারটিকে একবার স্বচক্ষে দেখার জন্য।

পুলিশ অফিসে অগণিত গাড়ির ভীড় জমে গেলো। হাজত কক্ষে লৌহ শিকলে হাত-পা শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় মহামান্য ডাঃ রায় দু'হাটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বসে আছেন। কান্দাই বাসীগণ বিস্ময় ভরা চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। হাজত কক্ষের একপাশে ডাঃ রায়-এর সেই অদ্ভুত লোমশ পোশাকটি পড়ে আছে, আরও আছে সেই বিস্ময়কর অস্ত্র দু'টি। যে অস্ত্র দুটি দ্বারা ডাঃ রায় তার হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে ছিলেন।

প্রত্যেকটা মানুষের মনে একরাশ কৌতুহল। যেমন তারা অবাক হয়েছে তেমনি হয়েছে আশ্বস্ত। আর তাদের জীবন নিয়ে আতঙ্কে কাল কাটাতে হবেনা। মৃত্যুর হীম স্পর্শ আর কাউকে স্পর্শ করবে না।

কান্দাই শহরের বুকে একটা অনাবিল আনন্দ স্রোত বয়ে চলেছে। এখানে সেখানে সব জায়গায় শুধু ঐ এক কথা, রহস্যময় হত্যাকান্ডের সমাধান হয়েছে। খুনী ডাঃ রায় তার গবেষণাগারে লোমশ দেহির পোশাকসহ গ্রেপ্তার হয়েছে। স্বয়ং দস্যু বনহুর এই হত্যা রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছে।

❑

নূরী বনহুরের চুলে আংগুল বুলিয়ে দিতে দিতে বললো—সত্যি তুমি আশ্চর্য মানুষ।

আজ বুঝি নতুন করে আবিষ্কার করলে? মৃদু হেসে বললো বনহুর।

নূরী বললো আবার—কি করে তুমি যে অসম্ভবকে সম্ভব করো বুঝতে পারি না। যে হত্যার রহস্য নিয়ে জাঁদরেল পুলিশ অফিসারগণ হাঁপিয়ে পড়েছিলো তুমি তাকে কেমন নিখুঁতভাবে উদঘাটন করলে। শুধু তাই নয় হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছো।

হাঁ, আমার এ সফলতার জন্য পুলিশ মহলের সহায়তা আমার কাম্য ছিলো। এজন্য আমি পুলিশ মহলকে ধন্যবাদ জানাই।

আচ্ছা হুর, তুমি পুলিশের চোখে ধোঁয়া দিয়ে নিজে সরে পড়লে কিন্তু পুলিশের অস্ত্রগুলি কি করে অকেজো হলো বললে না তো?

বনহুর একটু হেসে বললো—বলেছি তো সবই কৌশলে করেছি।

তবু বলোনা শুনি?

পুলিশ অফিসারগণ যখন তাদের অস্ত্রগুলি হাওয়ালদার গোমেশ চাঁদের কাছে দিয়েছিলেন সেগুলো ঠিক্‌মত কাজ করবে কিনা পরীক্ষা করে দেখার জন্য তখন গোমেশের কাজটা আমিই করি। গোমেশকে তখন অন্য কাজে পাঠিয়ে দিই। এবার বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই।

হাঁ-এ জন্যই তো বলি তুমি আশ্চর্য মানুষ।

মোটেই না।

ধরো তোমার কৌশল যদি ফাঁস হয়ে যেতো তখন কি করতে?

তখন অন্য উপায় অবলম্বন করতাম।

হুর!

বলো?

তুমি যে বলেছিলে এই হত্যা রহস্যের শেষ এখনও হয় নি!

হাঁ-নূরী, এ হত্যা রহস্য এখনও সম্পূর্ণ উদঘাটন হয়নি। কারণ হত্যাকারী গ্রেপ্তার হয়েছে কিন্তু হত্যা রহস্যের সঙ্গে জড়িত আছে কোন দেশ। এখন আমার কাজ সেই দেশ খুঁজে বের করা—কোন দেশ ডাঃ রায়কে এই কাজের জন্য নিযুক্ত করেছিলো।

বনহুরের কথায় মুহূর্তে নূরীর মুখখানা বিমর্ষ হলো, বললো—আবার তুমি এই হত্যা রহস্যের পিছনে আত্মনিয়োগ করবে?

হাঁ, যতক্ষণ না সেই বিদেশী ঘাটি আবিষ্কারে সক্ষম হয়েছি ততক্ষণ আমি শান্তি পাবোনা। আমি জানতে চাই অগণিত নীরিহ মানুষকে হত্যা করে তাদের অমূল্য প্রাণ বিনষ্ট করে এতো রক্ত আর এতো চোখ কোথায় যায়। শুধু ডাঃ রায়ই নয় এমন বহু ছদ্মবেশী নরহত্যাকারী এই পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে আত্মগোপন করে তাদের কাজ চালিয়ে চলেছে যা সভ্য সমাজের অনেকেই জানেন না। নূরী, আমি এই বিদেশী ঘাটিগুলোকে খুঁজে বের করবো এবং তাদের শায়েস্তা করবো! বনহুরের সুন্দর মুখমণ্ডল কঠিন হয়ে উঠলো।

নূরী তখনও স্বামীর চুলে আংগুল চালিয়ে চলেছে। এবার হাতখানা তার আপনা-আপনি থেমে যায়, বলে—ডাঃ রায়কে পুলিশের হাতে না দিয়ে তুমি তাকে আটক রেখে সব কিছু কথা জেনে নিতে পারতে, মার্কে তার কাছ

থেকে এই হত্যা রহস্যের মূল কারণ জেনে নিয়ে তাদের আসল ঘাটির সন্ধান জানতে পারতে।

নূরীর কথায় হাসে বনহুর—ডাঃ রায় কাঁচা মানুষ বা কচি ছেলে নয়। প্রাণ গেলেও তিনি এসব কথার একটিও ফাঁস করবেন না জানতাম। কাজেই তাকে হত্যা না করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছি কারণ কান্দাই বাসীগণ এ হত্যারহস্য নিয়ে ভীষণ উদ্বিগ্নতার সঙ্গে দিন কাটাচ্ছিলো। ডাঃ রায় যে এই হত্যাকান্ডের মূল নায়ক এটাই তাদের কাছে উদঘাটন হয় এটাই আমি চাই। নূরী আবার আমাকে কান্দাই ছেড়ে যেতে হচ্ছে এজন্য আমি দুঃখিত।

নূরী অভিমান ভরা গলায় বললো—দস্যু বনহুর কবে দুঃখ পেলো আর না পেলো আমি জানতে চাই না। আর কবেইবা সে কান্দাই স্থির হয়ে বসে রইলো তাও আমার জানার প্রয়োজন নাই।

বনহুর উঠে বসে ওর চিবুকটা তুলে ধরে বললো—রাগ করছো নূরী? তুমি তো জানো বিনা কারণে আমি কোনদিন বাইরে যাই না।

জানি কারণ তোমার কোনদিন শেষ হবে না। কোনদিন তুমি......

নূরী তুমি কি চাও আমি অকেজো হয়ে বসে থাকি? তুমি কি চাও আমি পঙ্গু হয়ে যাই?

না, আমি তা চাই না।

তবে কেনো তুমি আমার কাজে মাঝে মাঝে বাধা দাও—বলো তো?

এবার নূরী বনহুরের গলাটা বেষ্টন করে ধরে বলে—হুর তুমি কি জানোনা, তুমি না থাকলে তোমার আস্তানা কেমন ঝিমিয়ে পড়ে। তুমি কি জানোনা তোমার অনুচরেরা কেমন নিস্প্রাণ হয়ে যায়। তোমার তাজ খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দেয়।

সব জানি নূরী সব আমি জানি, কিন্তু পারি না কাজ রেখে চুপ চাপ বসে থাকতে। তা ছাড়া তুমি তো জানো এই হত্যার রহস্য কতবড় সাংঘাতিক। এই হত্যা রহস্যের উৎপত্তি কোথায় আমি তাই জানতে চাই। জানো নূরী শুধু কান্দাই নয় সমস্ত পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় এই হত্যার রহস্য সংঘটিত হয়ে চলেছে। নানা দেশে নানা ভাবে এরা কাজ করছে। প্রতিদিন এরা কত অমূল্য জীবন বিনষ্ট করছে তার হিসাব কেউ রাখে না। যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশেও এদের গোপন হত্যালীলা চলেছে।

নূরী বিস্ময় ভরা কণ্ঠে বললো—বাংলাদেশেও এই হত্যালীলা চলেছে?

হাঁ, বিদেশীরা বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে মিশে তারা বাংলার যুবক এবং শিশুদের রক্ত শুষে নিচ্ছে। নূরী, বলো এসব জেনে শুনেও কি আমি নিশ্চুপ বসে থাকতে পারি?

না তা পারো না।

হাঁ, সেই কারণেই আমি আবার এই নতুন অভিযানে আত্মনিয়োগ করবো।

বনহুর তার স্বর্ণ-খচিত সিগারেট কেস থেকে একটি সিগারেট বের করে তাতে অগ্নি সংযোগ করলো।

সবে মাত্র সিগারেটে বনহুরের ঠোঁট দু'খানা স্পর্শ করেছে অমনি তার পাশের ওয়্যারলেস কক্ষের সংকেতপূর্ণ ঘন্টা বেজে উঠলো।

বনহুর সিগারেটটা দূরে নিক্ষেপ করে উঠে দাঁড়ালো।

ততক্ষণে রহমান এবং বনহুরের কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর ছুটে এসেছে।

বনহুর ওয়্যারলেস কক্ষে প্রবেশ করে সাউন্ড বক্সের সম্মুখে দাঁড়ালো সঙ্গে সঙ্গে একটা নীলাভো আলো জ্বলে উঠলো এবং একটি গুরুগম্ভীর কণ্ঠ ভেসে এলো, সম্পূর্ণ অজ্ঞান আর অপরিচিত কণ্ঠস্বর। ...

সাংকেতিক শব্দ, বনহুর মনোযোগ দিয়ে শুনলো এবং টেপ করে চললো। কোন গোপন স্থানে স্থাপিত ট্রান্স মিটার থেকে শর্ট ওয়েভে বেতারে সাংকেতিক ভাষায় কথা হচ্ছিলো। বনহুরের ওয়্যারলেস যন্ত্রটি ছিলো অতি সূক্ষ্ণ। যে কোন গোপন ট্রান্সমিটারের বা বেতারের অনুষ্ঠান এই ওয়্যারলেসে ধরা পড়তো।

বনহুর শব্দগুলি টেপ করে নেবার পর ফিরে এলো তার দরবার কক্ষে। দরবার কক্ষে রহমান আর কায়েস ছিল তার পাশে।

বনহুর তার ওয়্যারলেস থেকে ধরা টেপ করা শব্দগুলি শুনলো একবার—দু'বার—তিনবার।

বনহুরের ললাটে গভীর চিন্তা রেখা ফুটে উঠলো। বললো সে এবার—রহমান যে ভাষা বা শব্দগুলো আজ আমি আমার কৌশলি ওয়্যারলেস যন্ত্র থেকে টেপ করতে সক্ষম হয়েছি এই শব্দগুলো আমাকে বিদেশী ঘাটি আবিষ্কারে অনেক সহায়তা করবে। কান্দাই হত্যা রহস্য ব্যাপার নিয়েই কান্দাই কোন গোপন ঘাটি থেকে বাইরের কোন দেশের সঙ্গে আলাপ চলছিলো। গতরাতে ডাঃ রায় গ্রেপ্তার হয়েছে এবং তার গবেষণারগার পুলিশ মহল দখল করে নিয়েছে এটাই জানানো হলো। আমার ওয়্যারলেস মেশিনে মিটার সংযোগ করা আছে যে মিটারে ধরা পড়েছে কান্দাই শহরের কত মাইলের মধ্যে এবং কোন দিকে এই বেতার যন্ত্র থেকে সাংকেতিক শব্দগুলো ভেসে এসেছিলো। থামলো বনহুর।

রহমান তাকালো বনহুরের হাতে একখানা কাগজ ছিলো সেই দিকে।

বনহুর কাগজখানা মেলে ধরে বললো—এই দেখো...

বনহুরের হাতের কাগজখানা একটি ম্যাপ। বনহুর ম্যাপটির এক জায়গায় আংগুল দিয়ে দেখিয়ে বললো—এই পর্বতমালা দেখছো এখানেই

কোন এক স্থান থেকে বেতার যন্ত্রে এই সাংকেতিক শব্দগুলি ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বলে আমি মনে করছি।

রহমান মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করছিলো এবার বললো সে—সর্দার, এ যে কান্দাই পর্বতমালা।

হাঁ, এই পর্বতমালার কোন এক গোপন স্থানে এদের ঘাটি আছে। রহমান, আমি ঘাটির সন্ধানে আজ রওয়ানা দিতে চাই। তুমি তাজকে প্রস্তুত করতে বলো।

সর্দার।

হাঁ, আমি একাই যাবো।

কিন্তু—

পরে হয়তো তোমাকেও প্রয়োজন হবে। বনহুর ম্যাপখানা মনোযোগ সহকারে দেখছিলো। হঠাৎ বলে উঠলো রহমান —এই পর্বতমালায় আমি একদিন সেই লোমশদেহি ড্রাইভারকে ফলো করে পৌঁছে গিয়েছিলাম কিন্তু সেদিন আমি ব্যর্থ হয়েছি......

সর্দার, এই পর্বতমালা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর আর রহস্যময়। এই পর্বতের কোন এক গুহায় মাঝে মাঝে নাকি নীলাভ আলো জ্বলতে দেখা যায়।

নীলাভ আলো?

হাঁ।

কই কোনদিন তো একথা তোমরা আমাকে বলোনি রহমান?

বলবার মত কোন সুযোগ আসেনি তাই বলা হয়নি।

বনহুর বললো—হুঁ। তার চোখ দু'টো যেন জ্বলে উঠলো জ্বলজ্বল করে। বললো আবার—রহমান, তুমি কি নিজে দেখেছো এই নীলাভ আলো?

না সর্দার।

তবে কে দেখেছে?

আমাদের অনুচর সিমলাই।

তাকে এক্ষুণি ডেকে আনো আমার কাছে।

রহমান কায়েসের দিকে তাকিয়ে বললো—যাও কায়েস সিমলাইকে ডেকে আনোগে।

কায়েস চলে গেলো।

একটু পরে ফিরে এলো কায়েস এবং তার সঙ্গে সিমলাই।

বনহুরকে কুর্ণিশ জানিয়ে সিমলাই সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

বনহুর বললো—তুমি কান্দাই পর্বতমালায় কবে কখন নীলাভ আলো দেখেছো?

সিমলাই বললো—সর্দার, আমি স্বচক্ষে দেখিনি তবে শুনেছি...

তুমিও স্বচক্ষে দেখোনি, শুনেছো?
হাঁ সর্দার। আমি সে কথাই রহমান ভাইকে বলেছিলাম।
কার কাছে শুনেছো?
আমার চাচার কাছে।
চাচা?
হাঁ সর্দার।
কে তোমার চাচা?
আমার চাচা হিমলাই সিং।
কোথায় থাকে সে?
ফিরু গ্রামে।
কান্দাই পর্বতমালার অদূরে সে ফিরু গ্রাম?
হাঁ সর্দার। আমার চাচা ফিরু গ্রামের চৌকিদার। একদিন ডিউটি দেবার সময় গভীর রাতে সে কান্দাই পর্বত মালার দিকে নীলাভ আলো দেখতে পেয়েছিলো।
শুধু একদিন?
ঠিক্ আমি জানিনা সর্দার।
বেশ আমি যাবো তোমাদের ফিরু গ্রামে।
আপনি যাবেন সর্দার? সিমলাই সিং ঢোক গিলে কথাটা বললো।
বনহুর বললো—হাঁ এবং আজকেই যাবো।
সর্দার।
তুমিও যাবে আমার সঙ্গে। রহমান, তাজকে প্রস্তুত করতে বলো। আর সিমলাই, তুমি তোমার ঘোড়া নেবে।
সিমলাই-এর বাড়িতে যাবে তাদের সর্দার এ যে তার পরম সৌভাগ্য কিন্তু ভয়ও হচ্ছে। সর্দারকে সে কোথায় বসতে দেবে কি তার জন্য ব্যবস্থা করবে। আর কিই বা খেতে দেবে। কেমন যেন হাবা গোবা বনে যায় সে।
বনহুর বলে উঠে—সিমলাই, সাবধান! কোনক্রমে তোমার চাচা যেন জানতে না পারে আমি কে।
তবে—তবে কি বলবো সর্দার।
বলবে আমার দোস্ত। আমরা এক সঙ্গে কাজ করি। এসেছি বুড়ো চাচাকে দেখতে বাস—বুঝলে?
বুঝেছি সর্দার। ভীত চোখে তাকালো সিমলাই সর্দারের মুখে।
বনহুর বললো—যাও তৈরি হয়ে নাও গে।
সিমলাই চলে গেলো।

বনহুর এবার কায়েসকে লক্ষ্য করে বললো—কায়েস, তুমি যাও তাজকে তৈরি করোগে।

কায়েস বেরিয়ে গেলো।

রহমান আর বনহুর ধীরে ধীরে দরবার কক্ষের দরজার দিকে এগুলো।

বনহুরের হাতের মুঠায় ম্যাপখানা আর রহমানের হাতে টেপ্‌রেকর্ড অদ্ভুত মেশিন।

❑

ফিরু গ্রাম।

পাথর আর টিলার উপরে ছোট গ্রাম খানা। মাঝে মাঝে ঝোপ ঝাড়, কোথাও বা বিস্তৃত প্রান্তর। ঝর্ণা আর নদী নালার অভাব নেই। ঝর্ণার দু'পাশে সবুজ ক্ষেত। নানারকম ফসলে ভরা এসব ক্ষেতগুলো।

ফিরু গ্রামের অধিবাসীরা কতকটা সাঁওতালদের মত। এদের বাড়ি ঘরগুলো পাতা আর খোলার তৈরি। কোন কোন বাড়ি ঘর মোটা কাঠের খুঁটির উপর বেশ উচুতে।

বনহুর আর সিমলাই সিং যখন ফিরু গ্রামে এসে পৌছলো তখন প্রায় ভোর হয়ে গেছে।

সূর্য সবেমাত্র পূর্বাকাশে উঁকি দেবে দেবে করছে। কুয়াশা তখনও সম্পূর্ণ কাটেনি। বনহুর আর সিমলাই নিজ নিজ অশ্ব থেকে নেমে দাঁড়ালো।

কাঠের খুঁটির উপরে পাশাপাশি দুটো ঘর। পাতার ছাউনি দিয়ে ঘর দুটো ছাওয়া। সবে মাত্র দরজার ঝাপ সরিয়ে সিমলাই এর চাচা বেরিয়ে এলো বাইরে। সাদা কালো একরাশ ঝাকড়া চুল মাথায়। বড় এক জোড়া গোঁফ। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি।

এতো ভোরে সিমলাইকে একজন সঙ্গীসহ দেখে চাচা ব্যস্ত কণ্ঠে বললো—আরে সিমলাই যে।

সিমলাই চাচাকে জড়িয়ে ধরে আনন্দ-ধ্বনি করে উঠতো কিন্তু সে সঙ্কোচিত হয়ে পড়লো কারণ তার সঙ্গে রয়েছে সর্দার দস্যু বনহুর। তবু হাসি মুখে বললো, চাচা তোমাকে দেখতে এলাম।

চাচা বড় ভাল বাসতো সিমলাইকে কারণ ছোট বেলায় সিমলাই মা-হারা। বাবাও তার মারা গেছে পাহাড় থেকে পড়ে। পাহাড় আর পর্বতের উপরে গাছে গাছে কাঠ কাটতো সে। বাবা মা মারা যাবার পর সিমলাইকে কোলে কাঁখে করে মানুষ করেছে ওরা চাচা। তাই ওকে বড় ভালবাসে।

চাচা কিন্তু সিমলাইকে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করলো।

চাচী ছিলো ঠিক তার বিপরীত। সিমলাইকে সে দু'চোখে দেখতে পারতোনা। তাই সিমলাই-এর মনে ছিলো একটা দূর্বলতা। চাচীকে সে বড় ভয় করতো ঠিক যমের মত।

চাচা সিমলাইকে জিজ্ঞাসা করলো—এটা বুঝি তোর দোস্ত?

সিমলাই ঢোক গিলে মাথা দোলালো।

চাচা এবার বললো—চল তোরা বসবি চল।

চাচা এগুলো, সিমলাই এবং বনহুর তাকে অনুসরণ করলো।

কাঠের সিড়ি বেড়ে উঠরে উঠে এলো চাচা, সঙ্গে দু'জন।

ছোট্ট মাচাঙ্গে দাওয়া।

কয়েকটা জলচৌকি ধরণের ছিলো, চাচা নিজে একটিতে বসে সিমলাই আর বনহুরকে বসার জন্য ইংগিৎ করলো।

সিমলাই তাকালো বনহুরের দিকে, চোখে তার শ্রদ্ধা আর ভয়।

বনহুরকে সে বসার জন্য অনুরোধ জানালো তার দৃষ্টির মাধ্যমে।

বনহুর আসার সময় বারবার সাবধান করে দিয়েছে তাকে যেন ভুল ক্রমেও সে সর্দার বলে না ডাকে।

সিমলাই-এর মুখে বহুবার সর্দার কথাটা তাই আসতে গিয়েও আটকে যাচ্ছিল।

বসলো বনহুর।

এবার সিমলাই জড়ো সড়ো হয়ে বসলো একটা জলচৌকিতে।

চাচা বললো—কেমন ছিলি রে সিমলাই?

ভাল ছিলাম চাচা।

তুই যেখানে কাজ করিস সেখানে এ বুঝি কাজ করে?

সিমলাই কোন জবাব দেবার আগেই বলে উঠে বনহুর—হাঁ চাচা, আমি সেখানেই কাজ করি।

তোর নাম কি বাপ?

সর্দারকে তার চাচা তুই বলছে এটা বড় খারাপ লাগলো সিমলাই-এর কাছে। মুখখানা সে কাঁচু মাঁচু করে ফেললো।

বনহুর চাচার কথার জবাব দিলো—আমার নাম রংলাল।

বাঃ বাঃ! চমৎকার নাম তোর বাপ। তা মনিব তোকে কত দেয়?

মাথা চুলকে জবাব দেয় বনহুর—সিমলাই যা পায় আমিও তাই পাই চাচা।

বনহুরের কথা বার্তায় চাচা খুব খুশি হয়ে পড়লো।

চাচা বললো—তোরা ক'দিন থাকবি তো, না রে সিমলাই?

এবারও বনহুর জবাব দিলো—হাঁ চাচা, দু'চার দিন থাকবো আমরা।

সিমলাই মাথা চুলকায় কারণ সে জানে তার চাচী কত বড় সাংঘাতিক মানুষ। এখানে বেশীক্ষণ তার থাকার ইচ্ছা নেই। চাচী যখন জানতে পারবে তারা এখানে দু'চার দিন থাকবে তখন একটা ভীষণ কান্ড বাঁধিয়ে বসবে। আসবার সময় সর্দার তাকে এমন কিছু বলেনি যে সেখানে তারা থাকবে।

সিমলাই তাই একটু হাবা বনে গেলো।

চাচা ঘরে প্রবেশ করতেই ঘন ঘনে গলা শোনা গেল—কে বাইরে কথা কয়?

চাচার গলা—সিমলাই আর তার এক দোস্ত এসেছে।

চাচী বোধ হয় তখনও শয্যাত্যাগ করেছিলো না। বিছানায়? শুয়ে শুয়েই চাচাকে প্রশ্ন করেছিলো এবার মনে হলো চাচী শয্যা ত্যাগ করে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। বললো—সিমলাই আর তার দোস্ত এসেছে।

বলিস—কি?

হাঁ, ওরা সারারাত ধরে ঘোড়ায় চড়ে এসেছে। শীতের রাত, বেচারীরা খুব কষ্ট পেয়েছে। একটু খেতে দেবো ভাবছি।

কি—কি কইলি? খেতে দিবি ওদের!

হাঁ, খেতে দেবো।

বড় আমার মরদ রে! আমি তোর ভাই পুতের জন্য খাবার তৈরি করে রেখেছি না?

কথাবার্তা ঘরের ভিতরে হলেও বাইরে স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিলো।

সিমলাই-এর মুখ কালো হয়ে উঠেছে, সে বার বার ভীত চোখে তাকাচ্ছে সর্দারের মুখে। হায় হায় সর্দার এর জন্য তাকে কি শাস্তি দেবে কে জানে।

কিন্তু সর্দারের মুখে সে কোন ক্রুদ্ধভাব দেখতে পেলো না। তবু তার ভয় আর আশঙ্কা।

এমন সময় বেরিয়ে এলো চাচা, দু'হাতে দু'টো থালা, থালা দু'খানায় কিছু ফলমূল আর পিঠা।

চাচা থালা দু'খানা এনে সবেমাত্র সিমলাই আর বনহুরের হাতে দিয়েছে অমনি চাচী রাক্ষসী মূর্তি ধারণ করে বেরিয়ে এলো। ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললো—রাত ফর্সা হতে না হতেই দোস্ত সঙ্গে হাজির হয়েছিস। তোর মরা বাপ মা কি এখানে সব তৈরি করে রেখে গেছে হতভাগা? নিজেই খেতে পাসনা তার আবার ঢং দেখো, দোস্ত এনেছে সঙ্গে করে।

সিমলাই-এর মুখ মরার মুখের মত ফ্যাকাশে হলো। সে একলা হলে এমন কত গালাগাল নীরবে হজম করে ফেলে কিন্তু তার সঙ্গে যে সর্দার

স্বয়ং এসেছেন তাদের বাড়িতে অতিথি হয়ে। সিমলাই এর যেন মাথা কাটা যাচ্ছিলো। কি করবে সে ভেবে পাচ্ছিল না। চাচাও একেবারে নাজেহাল, বৌ-এর কথায় কোন জবাব দিতে পারছিলো না। বৌকে তার বড় ভয় কারণ বড্ড ঝগড়াটে মেয়ে সে। একটুতেই ঝাটা নিয়ে মারতে পর্যন্ত আসে।

চাচা কোন কথা না বলে নীরবে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাতে লাগলো।

চাচী বললো—নে, খেয়ে শীগগীর বিদেয় হয়ে যা।

সিমলাই না খেলেও বনহুর কিন্তু খেতে শুরু করে দিয়েছে। তার মুখোভাবে কোন তিক্ততা বা ক্রুদ্ধতাভাব নেই। চাচীর গালাগাল যেন তার গায়েই লাগছে না।

সিমলাই যেন কতকটা আশ্চর্য হলো।

বনহুর বললো—খাও দোস্ত।

সিমলাই এবার কম্পিত হাতে থালা থেকে খাবার তুলে খেতে শুরু করলো।

বনহুর কিন্তু ফলমূল ছাড়া পিঠা বা অন্য জিনিস কিছু মুখে দিচ্ছে না।

খাওয়া শেষ হলো এক সময়।

চাচা এবার ভয় কম্পিত কণ্ঠে বৌকে লক্ষ্য করে বললো—ওরা বহুদূর থেকে এসেছে এক্ষুণি কেমন করে যাবে বল লাছমা? ওদের থাকতে বল না।

রুখে দাঁড়ালো স্বামীর দিকে মুখ করে লাছমা। মাথায় ঝাকুনি মেরে বললো—সিমলাই একা এলে না হয় দু'এক দিন থাকতো। ঐ দোস্তটা কি কম খাবে?

সিমলাই এর হাত থেকে শেষ খাবার টুকু পড়ে গেলো ভীত নজরে তাকালো সে সর্দরের মুখে।

বনহুর একটু হেসে বললো—চাচী, আমিও তোমার সিমলাই-এর মত। দুটো দিন খেলামই বা।

পারবি, কাঠ কেটে আনতে পারবি তুই? চাচী এবার বনহুরকে লক্ষ্য করে কথাটা বললো।

বনহুর খুশি হয়ে বললো—পারবো! পারবো চাচী যত কাঠ চাও আমি এনে দেবো।

ঐ যে পাহাড় দেখেছিস ওখান থেকে কাঠ কেটে আনতে হবে পারবি তো?

পারবো।

চাচী বললো—তবে দু'দিন থেকে যাবি ওর সঙ্গে। সিমলাইকে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো সে।

বনহুর মাথা দোলালো—আচ্ছা।

এতোক্ষণে চাচার মুখটায় হাসি ফুটলো। যা হোক তবু ভাইপো দু'দিন থেকে খাওয়ার অনুমতি পেলো।

চাচী ঘরে ঢুকে দু'টো ধারালো কুড়োল এনে একটা সিমলাই আর একটা বনহুরের হাতে দিয়ে বললো—এই নে এবার যা ঐ পাহাড়ের জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে আনগে। এলে ভাত পাবি।

সিমলাই ঢোক গিললো।

বনহুর হাসি মুখে কুড়োল দু'খানা চাচীর হাত থেকে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

সিমলাইও সর্দারের সঙ্গে উঠে পড়লো।

বনহুর একটা কুড়োল সিমলাই এর হাতে এগিয়ে দিয়ে বললো—চলো দোস্ত।

চাচা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছিলো, বললো—লাছমা, আমাকে একটা কুড়োল দে। আমিও কাঠ কাটতে যাবো।

চাচার ভয় সিমলাই-এর বাবা গাছ থেকে পড়ে মরেছে, পাছে সিমলাই পড়ে মরে তাই সেও সঙ্গে যাবে এই তার ইচ্ছা।

চাচী কিন্তু খেঁকিয়ে উঠলো—তোকে আর যেতে হবেনা! ওরা দু'জন যোয়ান মরদ আছে। আজ তুই বাড়ি বসে আরাম কর।

বনহুর আর সিমলাই সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলো।

চাচা কাঠের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে অসহায় চোখে তাকিয়ে রইলো আর চাচা রাক্ষুসী মূর্তি নিয়ে কট মট করে তাকাচ্ছে।

নিচে নেমে একবার বনহুর তাকিয়ে দেখে নিলো চাচীর মূর্তিটা।

ওরা দু'জন এবার কান্দাই পর্বতমালার দিকে পা বাড়ালো।

সিমলাই চলতে চলতে বললো—সর্দার আপনি কাঠ কাটবেন এও কি হয়?

হেসে বললো বনহুর—কেনো আমি কি মানুষ নই?

সর্দার আমার চাচী বড্ড বদরাগী।

তাতো দেখতেই পেলাম।

ঐ চাচীর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরেই তো আমি.....

আমাদের দলে যোগ দিয়েছো।

হাঁ সর্দার! কিছুক্ষণ মৌনভাবে চলে ওরা দু'জনা।

বনহুরের কাধে কুঠার। দেহের পোশাক তার ঠিক সিমলাই-এর মত। তাকেও একজন শ্রমিক বলে মনে হচ্ছিলো।

বনহুর চলতে চলতে বললো—তোমার চাচা বড় ভাল মানুষ সিমলাই।

হাঁ-সর্দার চাচা আমার বড় ভাল কিন্তু চাচীটার জন্য সংসারে শান্তি নাই। সর্দার আমার চাচী আপনাকে যাতা বললো, অপমান করলো—সে জন্য আমি মাফ চাই সর্দার।

হাসলো বনহুর—পাগল তুমি সিমলাই। চাচী আমাকে যাতা বললো বলে আমি রাগ করবো তোমার উপর? তোমার চাচী আমারও চাচী একটু গাল মন্দ করলোই বা।

তবু......

ও তুমি কিছু মনে করোনা।

সর্দার আপনি যে নীলাভ আলোর কথা চাচাকে জিজ্ঞাসা করবেন বলে ছিলেন?

করবো কিন্তু আজ নয়। সিমলাই!

বলুন সর্দার!

আমি তোমার চাচার বাড়ি কয়েকদিন থাকতে চাই।

ভাল কথা সর্দার কিন্তু আমার চাচীটা বড় চেঁচামেঁচি করে।

ও আমি সহ্য করে নেবো। আচ্ছা সিমলাই তোমার চাচী কি খেতে ভালবাসে?

একটু চিন্তা করে বললো সিমলাই—চাচী হরিণের মাংস খেতে খুব ভালবাসে।

বেশ, তোমার চাচী যাতে খুশি থাকে আমি তাই করবো। কারণ আমাকে তোমার চাচীর বাড়িতে থেকে কাজ করতে হবে। কিন্তু সাবধান! তোমার চাচা কিংবা চাচী যেন আমার আসল পরিচয় জানতে না পারে।

না, পারবে না সর্দার। তবে হঠাৎ আমার মুখে সর্দারটা এসে পড়ে।

খবরদার! যেন ভুল করেও কখনও সর্দার বলো না। দোস্ত বলবে।

আচ্ছা সর্দার।

আবার সর্দার?

না না আর বলবো না।

বলো দোস্ত।

দোস্ত আর বলবোনা!

যখন বনহুর আর সিমলাই কাঠ নিয়ে বাড়ি ফিরলো তখন সন্ধ্যা হয় হয়।

চাচা ঘর বার করছিলো কারণ সেই সাত সকালে সিমলাই আর তার দোস্ত গেছে পাহাড়ে কাঠ কাটতে। এখন সন্ধ্যা হয়ে এলো তবু ফিরে এলো না তাই তার চিন্তা। চাচী অবশ্য বার বার বলছে ওরা মরবে না, ওদের যমের প্রাণ। যখন ওরা দু'জন ফিরে এলো তখন খেকিয়ে বেরিয়ে এলো

চাচী। দু'হাত মাজায় রেখে বললো—দেখলি ও মরদ, দেখলি, আমি বলেছি ওদের যমের জান মরবে না। দে এবার খেতে দে।

চাচা মুখ কাঁচু মাঁচু করে বললো—দেখলি কত কাঠ কেটে এনেছে। অনেক কাঠ, বাজারে বেচলে অনেক পয়সা হবে। লাছমা এবার তুই খাইতে দে।

লাছমা ক্রুদ্ধভাবে সিমলাই এর দিকে তাকিয়ে বললো—ওখানে রাখ।

যাক তবু ভরসা হলো চাচার।

সে নিজ হাতে ওদের মাথা থেকে কাঠের বোঝাগুলো নামিয়ে রাখলো। তারপর বললো—যা তোরা ঝর্ণা থেকে হাত মুখ ধুয়ে আয়।

ওরা হাত মুখ ধুয়ে ফিরে এসে দেখলো চাচা আর চাচী মিলে তাদের জন্য খাবার নিয়ে বসে আছে।

পেট পুরে খেলো বনহুর আর সিমলাই।

বনে যাবার সময় বলে গেছে সিমলাই তার চাচাকে, আমার দোস্ত ফল খেতে বড় ভালবাসে। তাই চাচা অনেক ফল জোগাড় করে রেখেছিলো। বনহুর ইচ্ছামত ফল খেলো।

খাওয়া দাওয়া শেষ হলো—তার খেজুর পাতার চাটাইটার উপরে দেহটা এলিয়ে দিয়ে বললো—সিমলা আয় আমার গা টিপে দিবি আয়। বড্ড ব্যাথা করছে গা আমার।

সিমলাই কি করবে অগত্যা উঠে এলো চাচীর পাশে। জানে সিমলাই চাচীর অভ্যাস তার খাওয়া হলেই গা টিপতে হবে। কোন অতিথি এলেও বাদ যায় না। সিমলাই তাড়াতাড়ি এসে চাচীর পা টিপতে বসলো।

চাচী কিন্তু মাথা উঁচু করে দেখছিলো, এবার ডাক দিলো—এই সিমলার দোস্ত আয় তুই আমার গা টিপে দিবি আয়।

এবার বনহুরের মুখখানা কালো হলো বিশেষ করে সিমলাই তার অনুচর ওর সামনে একটা মেয়ে মানুষের গা টিপবে কেমন করে, যেন সঙ্কোচ লাগছে তার তবু বিলম্ব করলো না সে, আবার যদি রেগে যায় চাচী।

সিমলাই-এর মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠেছে, ফ্যাকাশে লাগছে তার চোখ দুটো। লজ্জায় মটির সঙ্গে যেন মিশে যাচ্ছিলো সে। সর্দারকে তার চাচী গা টিপতে বললো এ যেন তার ফাঁসির হুকুম।

বনহুর উঠে এসে চাচীর পাশে বসলো।

চাচী এবার তার মোটা মোটা হাত দুখানা তুলে দিলো বনহুরের কোলে—ভালো করে টিপে দে নইলে কাল খেতে দেবোনা।

সিমলাই যেন মাটিতে মিশে যাচ্ছিলো।

বনহুর সুন্দরভাবে চাচীর গা টিপতে শুরু করলো।

চাচী খুশিতে ডগ মগ হয়ে উঠলো, হেসে বললো—বাঃ বাঃ এতো সুন্দর গা টিপতে পারিস তুই? খুব ভাল-খুব ভাল.......আর সিমলাটা বড় আসলে দেখসিচ না আমার পা দু'খানায় যেন হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। হতভাগা শুধু গিলতে পারে—কাজ পারেনা।

চাচীর প্রশংসায় বনহুর আনন্দে আত্মহারা হলো। যাক তবু চাচীকে সে খুশি করতে পেরেছে। কাল আবার হরিণের মাংস খাওয়াবে, তাহলে যায় কোথা। খুব করে গা টিপছে বনহুর।

সিমলাই কিন্তু ঘুমে ঢুলছে।

চাচীর ও নাক ডাকছে এবার।

চাচা তো অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে।

বনহুর ডাকলো—সিমলাই?

চমকে উঠে জবাব দিলো সিমলাই—সর্দার।

বনহুর ঠোঁটে আঙ্গুল চাপ দিয়ে বললো—আবার।

নাক কান মলে বললো সিমলাই—আর বলবো না।

বনহুর বললো—তুমি ঘুমাও সিমলাই আমি একাই তোমার চাচীর পা টিপে দিচ্ছি।

আপনি......আপনি একা একা চাচীর গা টিপবেন আর আমি ঘুমাবো তা হয়না।

আমি বললাম তুমি ঘুমাও......যাও শুয়ে পড়ো।

সিমলাই-এর চোখ দুটো ঢুলু ঢুলু করছিলো, সারাদিন সে কাঠ কেটেছে, বড় ক্লান্ত অবসন্ন লাগছে তার। বেশি জেদা জেদি না করে শুয়ে পড়লো সিমলাই আলগোছে।

বনহুর চাচীর গা টিপছে বসে বসে।

এমন সময় ঘরের সবাই ঘুমিয়ে পড়ে। চাচীর দেহটা তো এলিয়ে পড়েছে, ঘুমে অচেতন সে।

বনহুর এবার উঠে দাঁড়ায়।

বেরিয়ে আসে সে কক্ষের বাইরে।

আকাশে অসংখ্য তারার মালা। কিন্তু চারিদিকে জমাট অন্ধকার। বনহুর দাওয়ায় দাঁড়িয়ে তাকায় সম্মুখে। দূরে অনেক দূরে কান্দাই পর্বতমালা, মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। সিমলাই বলছিলো তার চাচা নাকি দেখেছে ঐ পর্বতমালার কোন অংশে গভীর রাতে নীলাভ্র আলো জ্বলতে দেখা যায়। চাচাকে জিজ্ঞাসা করলে সে বলবে হাঁ তাই। কিন্তু বনহুর নিজের চোখে দেখবে কেমন আলো কিসের আলো। এই আলোর পিছনে লুকানো আছে গভীর কোন রহস্য। এজন্য তাকে চাচার বাড়িতে আশ্রয় নিতে হবে। যত

দিন না এই নীলাভ আলো রহস্য উদ্‌ঘাটন হয়েছে ততদিন তাকে থাকতে হবে এখানে। বনহুরের মনে হয় কান্দাই হত্যা রহস্যের সঙ্গে জড়িত আছে এই নীলাভ আলোটি।

বনহুর তার পকেট-থেকে বের করে ক্ষুদে বাইনোকুলারটি। চোখে লাগিয়ে তাকিয়ে থাকে সম্মুখের পর্বতমালার দিকে।

হঠাৎ তার বাইনোকুলারে ধরা পড়ে ক্ষুদ্র একটি আলোর বিন্দু।

আশার আনন্দে নেচে উঠে বনহুরের মন। কিন্তু মুহূর্তের জন্য আলোর বিন্দুটা দেখা যায় মাত্র তারপর আর কিছু নজরে পড়ে না।

বনহুর অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে পুনরায় আলোর বিন্দুটা নজরে আসে কিনা। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরও আর আলোর বিন্দুটা জ্বলে উঠলোনা।

বনহুর ফিরে এলো তার বিছানায়।

পরদিন ঘুম ভাংতেই শুনতে পেলো চাচীর গলা—এই সিমলাই এবার উঠ। কাঠ কাটতে যাবি কখন?

বনহুর চোখ রগড়ে উঠে বসলো।

সিমলাই তখনও নাক ডাকাচ্ছে।

বনহুরের ভয় হলো চাচীর মাথা বিগড়ে না যায় তাই সে উঠে সিমলাইকে জানালো তারপর বললো—চলো দোস্ত কাঠ কাটতে যাই।

চাচী তাড়া হুড়ো করে নাস্তা তৈরি করে দিলো।

আজ কিন্তু সে সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। নিজের হাতে নাস্তা তৈরি করে নিজেই খেতে দিয়ে বললো—তোরা পেট পুরে খা। সেই সন্ধ্যা বেলা আসবি বড় খিদে পাবে।

চাচীর কথায় দরদ ঝরে পড়ে।

সিমলাই-এর চোখে কিন্তু পানি এসে যায়। চাচীর গলায় এমন দরদ ভরা কথা সে কোনদিন শোনেনি। হয়তো মা থাকলে তাকে এমনি করে খেতে বলতো।

বনহুর খেতে শুরু করে।

শিমলাই খেতে শুরু করলো।

চাচী আজ পাশে বসে খাওয়ালো দু'জনাকে।

বনহুর আজ কাঠ কাটতে যাওয়ার সময় একটা তীর ধনু সঙ্গে নিলো। চাচীকে আজ সে হরিণের মাংস খাওয়াবে।

আজও বনহুর আর সিমলাই সারাদিন বনে ঘুরে অনেক কাঠ কাটলো। ভাগ্য ভাল বলতে হবে সন্ধ্যার কিছু পূর্বে একটা হরিণের বাচ্চা বনহুরের

নজরে পড়লো। আর যায় কোথায়, বনহুর তার তীর বিদ্ধ করলো হরিণ বাচ্চার পাঁজরে।

আজ বনহুর আর সিমলাই শুধু কাঠ নিয়েই ফিরলো না তার সঙ্গে হরিণের বাচ্চাও তারা এনেছে।

চাচী তো খুশিতে ডগ মগ। হরিণের বাচ্চার মাংস তার অতি প্রিয় খাদ্য। সুন্দর করে রাঁধলো চাচী হরিণের মাংস। বনহুর আর সিমলাইকে পেট পুরে খেতে দিলো।

আজও আবার চাচীর গা টিপতে হবে না কি? বললো বনহুর।

সিমলাই মাথা চুলকে বললো—চাচীর অভ্যাস। কেউ না থাকলে গোটারাত চাচা ওর গা টিপে দেয়।

তোমার চাচা হা হলে চৌকিদারির ডিউটি করে কখন?

চাচাকে সপ্তাহে তিন দিন ডিউটি করতে হয় আর বাকি চার দিন আর একজন আছে সেই করে। চাচা আবার ডাক বাংলায় কাজ করে কিনা।

ডাক বাংলো।

হাঁ, ঐ পূর্বদিকে একটা ডাক বাংলো আছে। আপনি দেখেননি ওটা।

এখানে ডাক বাংলো আছে তাতো জানতোম না।

আছে। ওখানে শহর থেকে মাঝে মাঝে বড় বড় সাহেবরা আসেন, থাকেন পাহাড়ে শিকার করেন।

বনহুর বললো—আজ আমাকে তোমাদের ডাক বাংলোয় নিয়ে যাবে।

আচ্ছা সর্দার।

আবার সর্দার বললে? দোস্ত তোমার মুখে আসেনা। আর শোন আপনি বলবেনা এখন থেকে আমাকে তুমি বলবে।

মাথা চুলকায় সিমলাই।

বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বলে—ফের যদি আপনি আর সর্দার বলছো তাহলে শাস্তি পাবে।

আচ্ছা আর আমার ভুল হবে না।

কুড়াল কাঁধে পরদিন বের হলো বনহুর আর সিমলাই। আজ ওরা বাংলোর পথে পা বাড়ালো। পাথর আর টিলা অতিক্রম করে এগিয়ে চললো ওরা। মাঝে সাঝে ঝর্ণাধারা ছোট ছোট পাথরের উপর দিয়ে আছাড় খেয়ে নিচে নেমে চলেছে। সূর্যের আলোয় ঝর্ণার পানির রূপালী বর্ণ সোনালী আকার ধারণ করেছে। অপূর্ব এ শোভা উপভোগ করতে করতে এগুচ্ছে বনহুর।

দস্যু হলেও সে মানুষ তাই তার মনকেও প্রকৃতির সৌন্দর্য-আকৃষ্ট করে। বনহুর এগুচ্ছিলো আর মুগ্ধ নয়নে দেখছিলো।

বাংলোর নিকটে পৌছে আরও মুগ্ধ হলো বনহুর। অতি সুন্দর মনোমুগ্ধকর জায়গায় বাংলোটা লাল মাটির বিস্তীর্ণ ভূ-খন্ডের উপরে ছোট লাল রংএর ডাক বাংলো।

বাংলোর পাশ কেটে চলে গেছে একটি পাহাড়িয়া নদী। নদীটায় বেশি পানি নেই, সচ্য সাবলীল পানির নিচে পাথরের নুড়ীগুলো সূর্যের কিরণে ঝলমল করছে।

বনহুর পা ডুবিয়ে একটু হেটে নিলো। হঠাৎ মনে পড়লো তাকে কাঠ নিয়ে বাড়ি ফিরতে হবে। না হলে চাচী রেগে আগুন হবে তাতে কোন সন্দেহ নাই।

বললো বনহুর—সিমলাই চলো এবার বনে যাই। কাঠ কাটতে না পারলে তোমার চাচী বড় ক্রুদ্ধ হবে।

চাচীর কথা মনে পড়তেই সিমলাই এর মুখ খানা ম্লান হলো তাড়াতাড়ি উঠে বললো—চলুন সর্দার।

গম্ভীর কণ্ঠে বললো—আবার সর্দার।

এখানে কেউ নেই তাই......

তবু বলবে না।

আচ্ছা।

কাঠ কেটে যখন তারা বাড়ি ফিরলো তখন বেলা পড়ে এসেছে। আজ কিন্তু চাচী খুশি হয়ে তাদের অভ্যর্থনা জানালো। বেশ হাসি হাসি মুখ যেন কত দরদিনী।

বনহুর যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো।

আজও আবার সেই অবস্থা।

রাতে খাওয়া দাওয়ার পর চাচীর শরীর দাবিয়ে দেওয়া।

আজ চাচার ডিউটি কাজেই খাওয়া দাওয়া সেরে চাচা চলে গেলো বাম হাতে লণ্ঠন আর ডান হাতে পাকা বাঁশের লাঠি নিয়ে।

আজ সিমলাই হাত আর বনহুর পা টিপতে বসলো চাচীর।

বেশিক্ষণ আজ পা টিপতে হলো না।

শিমলাই ঘুমিয়ে পড়লো অল্পক্ষণেই।

চাচীর নাক ডাকছে।

বনহুর বেরিয়ে এলো বাইরে।

নিস্তব্ধ অন্ধকার রাত্রি।

কাঠের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে বনহুর তাকালো সম্মুখে পর্বতমালার দিকে। পর্বতমালার পাদমূলে ঘনজঙ্গল। জঙ্গলের মাঝে স্থানে স্থানে ছোট ছোট টিলা।

বনহুর বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে দেখছে।

আজ কোন আলো দেখা গেলো না। এক সময় নীরাশ হৃদয় নিয়ে ফিরে এলো ঘরে। বিছানায় শুয়ে কিছুতেই ঘুমাতে পারলো না সে। এপাশ ওপাশ করতে লাগলো বনহুর। মনে তার নানা চিন্তার জাল ছড়িয়ে পড়েছে। কান্দাই পর্বত মালার কোন স্থানে ডাঃ রায় এবং তাদের দলের ঘাটি আছে। বনহুরের মনে পড়ে সে দিনের কথা লোমশ দেহে ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে এই পর্বতেরই কোন এক স্থানে উধাও হয়ে গিয়েছিলো। অনেক চেষ্টা করেও আর তাকে খুঁজে পায়নি।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলো বনহুর খেয়াল নেই, হঠাৎ চাচার ডাকে ঘুম ভেংগে যায়। ধড়মড় উঠে দরজার ঝাপ খুলে বলে চাচা।

হাঁ বাবা একটা খবর নিয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে এলাম। কি খবর চাচা?

ডাক বাংলোয় আজ বড় সাহেব আসবেন সঙ্গে তাঁর মেয়েও আসবে। খবর নিয়ে দারওয়ান আর বাবুর্চি এসেছে।

বড় সাহেব!

হাঁ বাপ বড় সাহেব।

কে সে চাচা? নাম কি তার?

বড় সাহেবকে তুই চিনিস না? এই অঞ্চলের মালিক তিনি। এই যে ফিরু গাঁও দেখছিস এটা ছাড়াও আরও ছ'টা গাঁও আছে। এই সবগুলো গাঁও এর মালিক। তাছাড়া পাহাড়তলির সব জায়গাগুলো তার। বড় ভাল মানুষ তিনি তার চেয়ে তার মেয়ে আরও ভাল জানিস বাপ।

তাতো বুঝলাম চাচা কিন্তু তার নাম কি বললেন না?

বড় সাহেবের নাম আমির আলী কায়েসী...তার মেয়ের নাম...

বা চমৎকার নাম চাচা তোমার বড় সাহেবের। থাক মেয়ের নাম আর বলতে হবে না...

চাচা এবার বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখে নিয়ে বলে উঠে—আমার যে অনেক কাজ বাকি আছে বাবা। ডাক বাংলো গোছাতে হবে, বাগান সাফ করতে হবে। বাগানে অনেক ঘাস জন্মেছে বড় সাহেব কিছু বলবে না কিন্তু তার মেয়ে বলবে সিমলাই এর চাচা তুমি বড় আলসে মানুষ এসব কিছু করো না। বখশিস মিলবে না কিছু......

তুমি কিচ্ছু ভেবো না চাচা আমি তোমাকে সাহায্য করবো।

ততক্ষণে সিমলাই এবং তার চাচী জেগে উঠে তাদের কথা শুনছিলো।

চাচী বলে উঠলো—হাঁ-হাঁ রংলাল তোকে সাহায্য করবে। আজ সিমলাই একাই যাবে বনে কাঠ কাটতে।

চাচীর কথায় কেউ প্রতিবাদ করতে সাহসী হবে না। সিমলাই বললো—আমি চাচার সঙ্গে কাজ করে তারপর কাঠ কাটতে যাবো। দোস্ত আজ আরাম করুক......

বনহুর বলে উঠলো—আরাম করার দরকার হবে না দোস্ত তুমি চাচীর কথামত কাজ করো।

চাচার সঙ্গে আজ বনহুর চললো ডাক বাংলা অভিমুখে।

সিমলাই মুখখানা ম্লান করে ফেললো কারণ সর্দারকে শেষ পর্যন্ত মালির কাজ করতে হলো। যে সর্দারের ভয়ে তারা সর্বক্ষণ তটস্থ থাকে, মুহূর্তে মুহূর্তে কুর্নিশ জানাতে হয় আর তারই সম্মুখে সে দিব্যি আরামে খাচ্ছে-দাচ্ছে ঘুরে বেড়াচ্ছে আবার ঘুমচ্ছেও। সিমলাই সঙ্কোচিত হয়ে পড়ে মাঝে মাঝে।

বনহুর তখনও অভয় দান করে! বুঝতে পারে সে সিমলাই-এর মনোভাব!

বনহুর চাচার সঙ্গে মনোযোগ সহকারে কাজ করছে। এক সময় বললো বনহুর, চাচা তুমি বাংলো পরিষ্কার করোগে আমি বাগান সাফ করছি।

খুশি হলো চাচা, বললো—হাঁ বাপ আমি বাংলোটা ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করিগে সাহেবের গাড়ি এসে পড়বে এক্ষুণি।

দারওয়ান আর বাবুর্চি তাদের নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত রয়েছে।

বনহুর মাথায় গামছা বেঁধে বাগান সাফ করছিলো।

দারওয়ান হুকুম করলো—এই মালি জলদি জলদি বাগান সাফ কর। বেটা মাইনে আর বখশিস খাস, কাজ করতে পারিস না?

এই করছি।

কেনো এতদিন সাফ করে রাখতে পারিসনি।

দারওয়ানের চিৎকার শুনে বেরিয়ে আসে চাচা, সে হাতে হাত রগড়ে বলে—ওকে কেনো গালমন্দ দিচ্ছো এ বাগান আর বাংলো দেখাশোনার ভার আমার উপর আছে। ও আমার ভাই-পোর দোস্ত...

তা এতোদিন কি নাকে তেল দিয়ে ঘুমছিলি বুড়ো?

মুখখানা ম্লান করে বললো—হাঁ আমি বুড়ো মানুষ, এক একা এতো বড় বাগান কি রোজ আমি সাফ করতে পারি?

তোর ভাই-পো আর তোর ভাই-পোর দোস্ত কি করে? ওরা তো কাজ করতে পারে।

পারে কিন্তু ওরা এখানে থাকে না, বেড়াতে এসেছে...

বেটা এই যে সাহেবের গাড়ি এসে গেছে...

সত্যই বড় সাহেবের বিরাট নীলাভ মাষ্টার বুইক গাড়িখানা দূরে দেখা গেলো।

বনহুরও দেখছিলো তাকিয়ে গাড়িখানাকে।

চাচা বললো—রংলাল বড় সাহেব এসে গেছে।

দেখতে দেখতে গাড়িখানার নিকটে এসে পড়লো।

দারওয়ান বাংলোর গেট খুলে সেলুট করে দাঁড়ালো।

চাচাও সালাম দিলো।

গাড়িখানা চলে গেলো লাল কাঁকড় বিছানো পথ বেয়ে বাংলোর গাড়ি বারেন্দার দিকে।

গাড়ি চালাচ্ছে বড় সাহেব নিজে আর পিছন আসনে বসে আছে এক তরুণী।

এক নজরে বনহুর বাগানের ওপাশ থেকে দেখে নিলো গাড়ির ভিতরটা। ড্রাইভ আসনে যিনি বসে আছেন তিনি প্রৌঢ় ভদ্রলোক। দেহে মূল্যবান সাহেবী পোশাক। মাথায় আমেরিকান ক্যাপ ঠোঁটের ফাঁকে মোটা চুরুট। পিছনের তরুণী অল্প বয়সী হলেও বিশ বাইশ বছরের কম হবে না। তার পরণে শাড়ী মাথার চুলগুলো ছোট করে ছাটা, কাঁধে ছড়িয়ে আছে। চোখে কাজল, ঠোঁটে লিপষ্টিক। এর বেশি নজরে পড়লো না বনহুরের।

গাড়িখানা চলে গেলো বনহুর কাজে মন দিলো।

চাচা চলে গেলো বাংলোর মধ্যে। বড় সাহেবকে তার খুশি করতে হবে।

দারওয়ান তার কাঁধের রাইফেল বাগিয়ে ধরে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

বনহুর ভাবছে গাড়িখানা নীলাভ। ভদ্রলোকের পোশাক পরিচ্ছদ নীলাভ বলে মনে হলো। পিছন আসনে তরুণীর শাড়িখানাকেও নীলাভ বলে মনে হলো তার। হয়তো চোখে ভুলও হতে পারে।

এক মনে কাজ করে চলেছে বনহুর।

সূর্যের তাপ ক্রমেই প্রখর হয়ে উঠেছে। পাথুরিয়া লাল মাটি সীসার মত গরম হয়ে পড়েছে। বনহুরের সুন্দর মুখমন্ডল রক্তাভ লাগছে। ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে।

হঠাৎ পিছনে একটি কোমল কণ্ঠ —এই মালি! ঐ ফুলটা দাও তো?

বনহুর কাঁচি হাতে ফিরে তাকায়। হঠাৎ ফিরে দৃষ্টি আটকা পড়ে যায়।

তরুণীও চট্ করে তার চোখ দুটো সরিয়ে নিতে পারে না।

বনহুর স্থির নয়নে দেখছে তরুণীর পা থেকে মাথা অবধি। পাতলা গঠন হলেও একেবারে হাল্কা নয়। দেহের রং সম্পূর্ণ ফিকে গোলাপী। একরাশ রেশমী চুল ছড়িয়ে আছে কাঁধের উপর, উজ্জ্বল নীলাভ দীপ্ত দুটি চোখে কাজল টানা। ঠোঁট দু'খানা গাড় লিপষ্টিকরঞ্জিত। শাড়ীখানা নিলাভ। শাড়ির

সঙ্গে যোগ করে ব্লাউজটাও নীলাভ। কানে দুটো নীলাভ পাথরের দুর। হাতে দু'খানা সরু সোনার চুড়ি। পায়ের জুতো জোড়াও নীলাভ।

বনহুর তরুণীর পা থেকে মাথা অবধি দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললো—মেম সাহেব ফুল দেবো?

তরুণী কোন জবাব দেবার পূর্বেই বনহুর কয়েকটা ফুল তুলে নিয়ে ওর সামনে এগিয়ে ধরে নিন।

তরুণী হতভম্বের মত হাত বাড়িয়ে ফুলগুলো নেয়। তখনও ওর দৃষ্টি বনহুরের মুখে স্থির হয়ে আছে। এবার তরুণী যেন সম্বিৎ ফিরে পায় ফুল হাতে দ্রুত চলে যায় সেখান থেকে।

বনহুর তরুণীর চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে ছিলো।

দারওয়ান বলে উঠে—এই মালি ওমন হাঁ করে কি দেখছো! বড় সাহেবের একমাত্র মেয়ে নীলা।

বনহুর অস্ফুট কণ্ঠে বললো—নীলা!

হাঁ—হাঁ—নীলা ওর নাম। বড় সাহেবের আদরিনী মেয়ে।

বনহুর ততক্ষণে পুনরায় কাজে মনোযোগ দিয়েছে।

চাচা তখন বাংলোর ভিতর পরিষ্কার করছিলো।

নীলা ফুলের গোছা হাতে চাচার পাশে এসে দাঁড়ায়—ও সিমলাই-এর চাচা।

কে মেম সাহেব?

হাঁ। আচ্ছা সিমলাই এর চাচা ও নতুন লোকটা কে? একেতো এর আগে দেখিনি?

ও রংলালের কথা বলছেন মেম সাহেব?

ঐ যে বাগানের যে কাজ করছে তার কথা বলছি।

ঐ তো রংলাল। সিমলাই এর দোস্ত।

সিমলাই এর বন্ধু?

হাঁ মেম সাহেব বড় ভাল ছেলে। সিমলাই এর সঙ্গে একই জায়গায় কাজ করে। কয়েক দিনের ছুটি নিয়ে ফিরু গাঁও দেখতে এসেছে।

চাচা কথার ফাঁকে কাজ করছিলো, নীলা বলে আবার—সিমলাই এর চাচা......

বলুন মেম সাহেব?

রংলাল—তোমাদের ওখানেই থাকে বুঝি?

হাঁ। চাচা আবার কাজে মনোযোগ দেয়।

এবার নীলা ফিরে যায় তার বাবার পাশে।

আমীর আলী তার কক্ষের সোফায় হেলান দিয়ে বসে কিছু করছিলো।

নীলার পদশব্দে তিনি তাড়াতাড়ি পকেটে কিছু লুকিয়ে রাখলেন।
নীলা ডাকলো—আব্বু।
মা নীলা।
আব্বু দেখো কি সুন্দর ফুল গুলো।
হাঁ মা ফুল সব সময়ই সুন্দর হয় কিন্তু ঐ সুন্দর ফুলেও বিষ কীট লুকিয়ে থাকে।
আব্বু।
হাঁ মা। তাই সব সময় ফুল হাতে নিতে নাই।
আব্বু তুমি বড় নীরস মানুষ। এতো সুন্দর ফুল গুলো তুমি...
বসো নীলা।
আব্বু আমার খুব ভাল লাগছে।
তোমার ভাল লাগলেই-তো আমারও ভাল লাগবে মা! নীলা আমাকে একটু বাইরে যেতে হবে তুমি বাংলোতেই অপেক্ষা করো কেমন?
আব্বু আমাকে নিয়ে যাবে তোমার সঙ্গে?
আজ নয় মা। তাছাড়া আজ অনেক দূরে যাবো তোমার কষ্ট হবে।
বেশ আমি কিন্তু এরপর তোমার সঙ্গে যাবো।
যেও মা, যেও।
আমীর আলী কায়েসী এবার উঠে পড়লেন।
এমন সময় বাবুর্চি এসে বললো স্যার খাবার তৈরি হয়ে গেছে।
আমীর আলী কায়েসী বললো—হাঁ আমি খেয়েই যাবো। টেবিলে খাবার দাও!
বাবুর্চি চলে গেলো।
আমীর আলী এবার কন্যাকে লক্ষ্য করে বললেন—এসো মা এক সঙ্গে খেয়ে নি।
নীলাও পিতার সঙ্গে খাবার টেবিলের পাশে এসে বসলো।
খাওয়া শেষ করে বেরিয়ে গেলো রিজভী সাহেব।
নীলা তাকে হাত নেড়ে বিদায় সম্ভাষণ জানালো।
যতক্ষণ গাড়ি দেখা গেলো নীলা গাড়ি বারেন্দায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইলো তার আব্বুর চলে যাওয়া গাড়িখানার দিকে।
দৃষ্টির আড়ালে গাড়ি চলে যেতেই এগিয়ে এলো নীলা বাগানের পাশে।
বনহুর তখনও কাজ করছিলো।
নীলা ডাকলো—এই মালী।
বনহুর ফিরে তাকালো—আমাকে ডাকছেন মেম সাহেব।
হাঁ শোন।

বনহুর কাঁচি হাতে এগিয়ে এলো।

নীলা বললো—এই রোদে আর কাজ করতে হবে না।

বনহুর বললো—বাগানে যে অনেক ঘাস রয়েছে।

কাল সকালে আবার করবে।

এখন তা হলে কি করব মেম সাহেব?

এখন তোমার কিছু করতে হবে না। ঐ ওখানে বসো।

চাচা বকবে।

আমি তাকে বলবো তোমাকে ছুটি আমিই দিয়েছি। আচ্ছা রংলাল?

চমকে উঠলো বনহুর তার ছদ্মনামটা এ জানলো কি করে, বললো—মেম সাহেব আমার নাম রংলাল আপনাকে কে বললো?

তোমার চাচা।

ও! বলুন মেম সাহেব?

তোমার বাড়ি কোথায় রংলাল?

বাড়ি?

হাঁ।

অনেক দূরে।

তবু নাম তো আছে।

আছে। আমার বাড়ি ঝিন্দ শহরে।

ঝিন্দ শহরে?

হাঁ মেম সাহেব।

দেশে তোমার কে কে আছে?

বাবা নেই মা আছে। বুড়ো মা।

নীলা আরও কিছু যেন জানতে চায়। মুখখানা তার রাঙা হয়ে উঠে নিজের অজ্ঞাতে।

বনহুর নীলার মুখোভাব লক্ষ্য করে মাথা নিচু করে একটু মৃদু হাসে।

নীলা আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করে না।

বনহুরও কিছু বলে না।

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব।

এমন সময় চাচা এসে পড়ে—রংলাল তোর কাজ হলো?

এবার নীলা বলে উঠলো—আজ থাক, কাল সকালে বাকিটুকু শেষ করবে। দেখছো না বাগানে যা রোদ।

বনহুর বলে—তা হলে এখন যাই মেম সাহেব?

চাচা কোন কথা বলে না কারণ কাজ শেষ না করে গেলে সে দোষী হবে। তা ছাড়া মেম সাহেব আজ এতো নরম হয়েছেন অন্যদিন বাগান পরিষ্কার না হলে কিছুতেই ছুটি মিলতো না।

নীলা বললো—আচ্ছা তোমরা আজ যাও কাল সকালে এসো কিন্তু...

আসবো মেম সাহেব। বললো বনহুর। তারপর লম্বা সেলাম দিয়ে চাচাকে লক্ষ্য করে বললো—চলো চাচা।

বনহুর আর চাচা চলে গেলো।

নীলা দাঁড়িয়ে রইলো।

বনহুর বাড়ি ফিরে এলো। আজ তাকে বেশি প্রসন্ন মনে হচ্ছে। খুশি হয়ে চাচীর সঙ্গে কাজে যোগ দিলো সে।

একদিনেই বনহুর চাচীর সঙ্গে বেশ খাতির জমিয়ে নিয়েছে। সেই রুক্ষ কড়া মেজাজী চাচী একবারে পাল্টে গেছে যেন। বনহুর বললো—চাচী দাও তোমার ময়দা করার ভারটা আমার উপরে দাও।

চাচী তো বেঁচেই গেলো।

বনহুর চাচীর হাত থেকে কাঠের বলয়টা নিয়ে ময়দা করতে শুরু করলো।

সিমলাই ফিরে এলো সন্ধ্যার কাছাকাছি। একবোঝা কাঠ সে টেনে এনেছে। চাচী রুটি তৈরি করে সবাইকে খেতে দিলো।

আজও চাচার ডিউটি আছে।

রাতে সে বাড়ি থাকবে না।

সিমলাই আর বনহুর রইলো বাড়িতে।

বনহুরকে অবশ্য তাজের সেবা করতে হয় তাই ওর কিছু সময় কাটে তাজের সঙ্গে। তাজকে নিজ হাতে খাওয়ায় এবং গা ডলে দেয় বনহুর।

সিমলাইও করে সময় মত।

রাতে চাচীর গা টিপা একটা দৈনন্দিন কাজ। প্রতিদিনের মত আজ রাতেও চাচীর গা টিপতে বসলো সিমলাই আর বনহুর।

এখন অবশ্য সিমলাই-এর কিছুটা সয়ে উঠেছে। সে সদা-সর্দারের পাশে জড়োসড়ো হয়ে থাকতো। সঙ্কোচ আর দ্বিধা নিয়ে চলাফেরা করতো। সে ভাবটা বনহুর অনেক করে ছাড়িয়েছে।

সিমলাই আজ একা বনে কাঠ কাটিতে গিয়েছিলো তাই বেশি পরিশ্রম হয়েছে ওর। অল্পক্ষণেই সিমলাই হাই তুলতে শুরু করে।

বনহুর হেসে বলে—যাও দোস্ত শুয়ে পড়ো।

সিমলাই প্রতিদিনের মত বিনা বাক্যে শয্যা গ্রহণ করলো।

বনহুর ডাকলো—চাচী চাচী...

চাচী তখন নাক ডাকছে।

বনহুর তবু আরও কিছুক্ষণ ওর গা টিপলো তারপর বেরিয়ে এলো বাইরে।

দাওয়ায় এসে দাঁড়াতেই জমাট অন্ধকার তাকে অভিনন্দন জানালো।

কক্ষমধ্যে এতোক্ষণ ল্যাম্পের আলোর পাশে চোখ দুটো তার বাঁধিয়ে গিয়েছিলো। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে তাকালো সম্মুখে দূরে বহু দূরে পর্বত মালার দিকে।

এক মিনিট দু'মিনিট করে কয়েক মিনিট কেটে গেলো। বনহুর চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে দেখেছে। নেমে এলো নিচে, এগুতে লাগলো দক্ষিণে, তাকালো এবার বনহুর ডাক বাংলোর দিকে।

হঠাৎ দেখলো একটা নীলাভ আলো বিন্দু ডাক বাংলোর সম্মুখে দুলছে। বনহুর চোখে বাইনোকুলার লাগাতেই আলো বিন্দুটা স্পষ্ট নজরে পড়লো। আসলে সেটা আলোর বিন্দু নয় একটা টর্চের আলো দুলছে। মনে হলো কেউ আলোটা দোলাচ্ছে। অন্ধকারেও বনহুরের মুখমণ্ডল দীপ্ত হয়ে উঠলো।

কয়েক মিনিট আলোটা দুললো।

বনহুর মাঝে মাঝে বাইনোকুলারের ফাঁকে চোখটাকে পর্বত মালার দিকে ফিরিয়ে নিচ্ছিলো। হঠাৎ দৃষ্টি তার এক সময় স্থির হয়ে পড়লো পর্বত শ্রেণীর এক জায়গায়, একটা নীলাভ আলো জলে উঠলো এ আলোটা বেশ বড় এবং গোলাকার।

বনহুর একবার ফিরে দেখে নিলো, ডাক বাংলোর সম্মুখে আলোর বলটা ঠিক পূর্বের মতই দুলছে।

পর্বত মালার আলোটা স্থির হয়ে আছে একবার নিভলো আবার জ্বললো,. আবার নিভলো। বনহুর বাইনোকুলারে চোখ লাগিয়ে দেখছে। আবার জ্বললো। একবার দু'বার তিনবার জ্বললো আর নিভলো। তারপর আলোটা দপ করে নিভে গেলো আর জ্বললো না।

এদিকে ডাক বাংলোর পাশে ও আর সেই আলোর বিন্দুটা নেই। বনহুর অন্ধকারে অট্ট হাসিতে ভেংগে পড়লো। সে হাসির শব্দে নিস্তব্ধ ফিরু গাঁও যেন থর থর করে কেঁপে উঠলো।

ফিরে এলো বনহুর তার শয্যার পাশে।

হঠাৎ চাচী কোঁকিয়ে উঠলো—সিমলাই রংলাল তোরা এরই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছিস আমার হাত পা যে টন টন করছে।

সিমলাই এর তখন নাক ডাকছে।

বনহুর বললো—যাই চাচী।

আয় আমি যে ব্যথায় মরে গেলাম।

বনহুর এসে বসলো চাচীর পা টিপতে। যেমন সে পায়ে হাত দিয়েছে অমনি চাচী বলে উঠলো হারে রংলাল তোর হাত এতো ঠান্ডা কেনোরে?

বনহুর ঢোক গিলে আমতা আমতা করে বললো—হাত দু'খানা কাঁথার বাইরে রেখেছিলাম চাচী তাই।

এবার বনহুর বার বার হাই তুলতে থাকে, কারণ সমস্ত দিন এবং রাতের প্রায় দু'ভাগ সে এতোটুকু বিশ্রাম করেনি। ঘুম পাচ্ছে এখন তার।

❑

নীলা গাড়ি বারেন্দায় দাঁড়িয়ে তাকিয়েছিলো পথের দিকে। কারো জন্য যেন সে প্রতিক্ষা করছে বলে মনে হলো। মুখোভাবে অস্থিরতার ছাপ ফুটে উঠেছে।

আমির আলী কায়েসী জানালার পাশে একটি সোফায় সংবাদপত্র নিয়ে বসেছেন। এখনও চা নাস্তা হয়নি।

বাবুর্চি পাক শালায় সকালের নাস্তা তৈরি নিয়ে ব্যস্ত।

দারোয়ান বাংলোর গেটে রাইফেল কাঁধে পাহারা দিচ্ছে।

অদূরে দেখা গেলো চাচা আর রংলালকে।

নীলার চোখ দুটো দীপ্ত হয়ে উঠলো। গাড়ি বারেন্দা থেকে নেমে এগিয়ে গেলো সে গেটের দিকে। ততক্ষণে রংলাল আর চাচা প্রায় গেটের সামনে এসে পড়েছে।

নীলা দারওয়ানকে গেট খুলে দিতে নির্দেশ দিলো।

রংলাল আর চাচা প্রবেশ করলো গেটের মধ্যে।

নীলা বললো—দেরী করলে কেনো তোমরা?

চাচা জবাব দিলো—সমস্ত রাত গাঁও পাহারা দিয়েছি মেম সাহেব। সকালে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

বনহুর শুধু একটু হাসলো, কোন কথা সে বললো না।

নীলাও চট করে ওকে কোন প্রশ্ন করে উঠতে পারলো না। একটা লজ্জা তাকে সঙ্কোচিত করে তুললো।

চাচা এবং রংলাল চলে গেলো নিজ নিজ কাজে।

নীলা এবার পিতার কক্ষে প্রবেশ করে ডাকলো আব্বু।

এই যে মা বসো।

আব্বু তুমি আজ বাইরে যাবে না?

হাঁ মা যাবো, আজ তোকে সঙ্গে নিয়ে যাবো।

উঁ হুঁ আমার শরীর আজ ভাল লাগছে না আব্বু। তুমি আজও বরং একাই যাও কাল আমি তোমার সঙ্গে যাবো।

শরীর ভাল লাগছে না এটা কেমন কথা মা? কি হলো ডাক্তার ডেকে পাঠাবো কি?

নানা তেমন কিছু না, এমনি মাথাটা একটু ধরেছে।

রাতে বুঝি ঘুম হয়নি?

না।

কেনো মা?

কিছু না আব্বু, তুমি বসো আমি বাগান থেকে ফুল নিয়ে আসি...

আমির আলী সাহেব কিছু বলবার আগে বেরিয়ে যায় নীলা।

বনহুর সবে মাত্র খুরপি হাতে ঘাস পরিষ্কার করতে বসেছে। খানিকটা ঘাস পরিষ্কার করেছে সে এমন সময় পিছনে এসে দাঁড়ায় নীলা। ডাকে—এই রংলাল।

বনহুরের হাতে খুরপি থেমে যায়, ফিরে তাকিয়েই বলে উঠে দাঁড়ায় মেম সাহেব।

আমাকে কিছু ফুল দাও না।

আচ্ছা দিচ্ছি। বনহুর খুরপি রেখে কাঁচি হাতে ফুল কাটতে থাকে।

এগিয়ে যায় নীলা বনহুরের পাশে—রংলাল ফুল তুমি ভালবাসো?

মেম সাহেব আমরা গরিব মানুষ খেতে পাই না, ফুল ভালবেসে কি করবো? ফুল তো আপনাদের জন্য......

কি—কি বললে রংলাল?

কিছু না মেম সাহেব। নিন ফুল নিন।

দাও। বাঃ খুব সুন্দর ফুলগুলো।

আপনার চেয়ে সুন্দর নয় মেম সাহেব।

কি বললে?

না কিছু না।

বলো—বলো রংলাল কি বললে?

ফুলের চেয়ে আপনি সুন্দর কিনা তাই বললাম।

রংলাল! নীলা অস্ফুট কণ্ঠে বললো। তারপর দ্রুত চলে গেলো নীলা সেখান থেকে।

ততক্ষণে বাবুর্চি টেবিলে চা নাস্তা এনে সাজিয়ে রেখেছে।

নীলা এসে খাবার টেবিলের ফুলদানীতে ফুলগুলো গুজে রেখে বলে উঠলো—আব্বু এসো চা নাস্তা ঠান্ডা হয়ে গেলো।

হাঁ আসছি মা।

আমির আলী সাহেব উঠে এসে চায়ের টেবিলের পাশে বসলেন।

চা নাস্তা খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এমন সময় একটা গাড়ি এসে ঢুকলো ডাক বাংলার গেটের মধ্যে।

গাড়ির শব্দে বনহুর ফিরে তাকালো।

দারওয়ান গেট খুলে সরে দাঁড়িয়েছে।

বনহুর দেখলো গাড়িখানার পিছন অংশ সম্পূর্ণ বন্ধ কিন্তু ঠিক এম্বুলেন্স গাড়ির মত দেখতে। গাড়ি খানায় ক্রস চিহ্ন দেওয়া আছে। কোন হসপিটালের গাড়ি হবে।

বনহুর কাজের ফাঁকে তীক্ষ্ণ নজরে তাকিয়ে দেখতে লাগলো।

গাড়িখানা গিয়ে গাড়িবারেন্দায় দাঁড়িয়ে পড়েছে।

গাড়ির ড্রাইভিং আসন থেকে নেমে পড়লো সাদা চামড়া একটি লোক। লোকটা যে বিদেশী তাতে কোন ভুল নেই।

গাড়িখানা পৌঁছতেই আমির আলী সাহেব চায়ের টেবিল থেকে উঠে পড়লেন। ব্যস্ত সমস্ত ভাবে বেরিয়ে এলেন বাইরে।

বনহুর দেখছে আমির আলী আর সাদা চামড়া লোকটার মধ্যে কি সব কথাবার্তা হলো। সাদা চামড়া লোকটা তার গাড়ির পিছন অংশের দরজা খুলে একটা বাক্স বের করে নামিয়ে রাখলো তারপর দরজা বন্ধ করে পুনরায় গাড়িতে চেপে বসলো।

আমির আলীর নির্দেশে দারওয়ান বাক্সটা তুলে নিয়ে ভিতরে চলে গেলো।

ততক্ষণে গাড়িটা ছেড়ে দিয়েছে।

হাত নাড়ছে আমির আলী।

বনহুর সব লক্ষ্য করলো। দু'চোখে তার বিস্ময় আর জানার বাসনা। যা চেয়েছে হয়তো তারই সন্ধান সে পাবে এখানে।

কয়েক মিনিটেই গাড়িখানা উল্কার মত বেরিয়ে গেলো। বনহুর গাড়ির পিছন অংশে আটকানো গাড়ির নম্বরটা দেখে নিলো। গাড়িখানা কান্দাই এর নয় কারণ ইংরেজিতে তিনটা অক্ষর লেখা আছে এফ্ এন্ এইচ্।

বনহুর অক্ষর তিনটা মনে মনে উচ্চারণ করলো।

গাড়িখানা বিদায় হবার অল্পক্ষণ পর আমির আলী সাহেব তার গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

নীলা তাকে হাত নেড়ে বিদায় জানালো।

গাড়িখানা বেরিয়ে যাবার পর নীলা তার কক্ষে এসে বসলো। একখানা বই নিয়ে নাড়াচাড়া করলো কিছুক্ষণ। তারপর বেরিয়ে এলো বাইরে। গাড়ি বারেন্দায় দাঁড়িয়ে ডাকলো—এই রংলাল?

বনহুর খুরপি রেখে উঠে দাঁড়ালো—আমাকে ডাকছেন মেম সাহেব?
শোন।
রংলাল বেশী বনহুর উঠে এলো গাড়ি বারেন্দায়।
নীলা বললো—শোন রংলাল।
নীলা তার বিশ্রাম কক্ষে প্রবেশ করলো।
বনহুর নিজের ধূলোমাখা পায়ের দিকে তাকালো একবার তারপর নীলাকে অনুসরণ করলো।
নীলা তার নিজের কক্ষে প্রবেশ করে একটা সোফায় বসে পড়লো।
বনহুর এসে দাঁড়ালো তার পাশে—মেম সাহেব।
নীলা শাড়ীর আঁচল খানা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বললো—জানো রংলাল তোমাকে কেনো ডেকেছি?
না মেম সাহেব জানি না।
রংলাল।
বলুন?
তুমি লেখাপড়া জানো?
না মেম সাহেব লেখাপড়া জানবো কি করে। আমরা গরিব মানুষ......
গরিব মানুষ হলেই লেখাপড়া শিখতে নাই নাকি?
মানে—অতো টাকা পয়সা পাবো কোথায়......
তোমার কি লেখাপড়া শিখতে ইচ্ছা হয়না রংলাল?
হয়।
আমি তোমাকে টাকা পয়সা দেবো লেখাপড়া শিখবে তুমি?
শিখবো কিন্তু......
আবার কিন্তু কি বলো?
কে আমাকে লেখাপড়া শেখাবে মেম সাহেব?
তাইতো। আচ্ছা রংলাল তুমি শিমলাই-এর সঙ্গে একই...
হাঁ মেম সাহেব একই জায়গায় কাজ করি।
শুনেছি শিমলাই নাকি কোন কারখানায় কাজ করে?
হাঁ আমিও সেই কারখানায় কাজ করি।
কত মাইনে পাও?
শিমলাই যা পায় আমিও তাই পাই মেম সাহেব।
শিমলাই বলেছিলো মাসে নব্বেই পায়।
আমিও তাই পাই?
এই সামান্য টাকায় তোমার সংসার চলে?
অনেক কষ্ট হয়।
এক কাজ করো রংলাল

বলুন মেম সাহেব?
তুমি ও চাকরী ছেড়ে দাও।
তাহলে খাবো কি? আমার বাড়িতে......
তোমার বাড়িতে এক মা তো?
হাঁ মেম সাহেব।
আর কেউ নেই বুঝি?
বনহুর মাথা চুলকায়—না, মা ছাড়া আর কেউ নেই আমার।
নীলার মুখ খুশিতে দীপ্ত হয়ে উঠে। বলে সে—বিয়ে করোনি বুঝি?
বিয়ে। বিয়ে কে দেবে আমার কাছে মেম সাহেব।
কেনো এতো সুন্দর তুমি......
একটু হেসে বলে বনহুর—আমি সুন্দর? লোকে বলে আমি নাকি কুৎসিত।
নীলা খিল খিল করে হেসে উঠলো। তারপর বললো—সত্যি রংলাল তোমার মত সুন্দর পুরুষ আমি দেখিনি কোথাও। তুমি যদি ভদ্র লোকের ঘরে জন্মাতে, লেখাপড়া শিখতে......সত্য তুমি অপূর্ব এক পুরুষ হতে রংলাল। আচ্ছা রংলাল এ চাকরী তুমি ছেড়ে দাও।
কি করবো তাহলে?
আমাদের বাড়িতে অনেক লোকের দরকার। আব্বুকে বলে তোমার চাকরী করে দেবো। জানো রংলাল আব্বুর অনেক টাকা। তোমাকে অনেক টাকা মাইনে দেবো। প্রথমেই তোমাকে দু'শো দেবো বুঝলে? তাছাড়া আমার মা নেই ভাই বোন কেউ নেই শুধু আমি আর আমার আব্বু। তোমাকে আমি নিজে পড়াবো রংলাল।
সত্যি মেম সাহেব?
হাঁ তোমাকে আমি নিয়ে যাবো শহরে। রংলাল লেখাপড়া শিখতে তোমার ইচ্ছা হয়?
হয় কিন্তু এতো বয়সে......
তাতে কি আছে লেখাপড়া কোনদিন বুড়ো হয় না। তাছাড়া তোমার এমন আর কিই বা বয়স হয়েছে। শোন কাল সকলে আব্বুর সঙ্গে দেখা করবে। আমি আজ আব্বুকে বলে সবঠিক করে রাখবো।
আচ্ছা মেম সাহেব। যাই এবার?
বাগানের কাজ শেষ হয়নি তোমার?
হয়েছে একটু বাকি আছে।
এতো রোদে কাজ করে তোমার খুব কষ্ট হয় না?

কষ্ট। না কষ্ট হয় না। ওসব আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে। আচ্ছা যাই......বনহুর বেরিয়ে যায়।

আবার বনহুর বাগানে গিয়ে বসে, আর সামান্য বাকি তাহলেই বাগানের কাজ শেষ হয়ে যাবে। তারপর এখানে আসবে সে কোন উদ্দেশ্য নিয়ে। কিন্তু এখানে না এলেই নয়। কান্দাই পর্বতমালার সেই নীলাভ আলোর সঙ্গে ডাক বাংলোর মহান ভদ্রলোক আমির আলীর যে সংযোগ আছে তাতে কোনো সন্দেহ নাই। যাক নীলার দৃষ্টি তাকে আকর্ষণ করেছে এটাই তার সৌভাগ্য তার কাজ উদ্ধারের প্রথম সোপান।

পিতা ফিরে এলে নীলা আব্বাকে বললো এক সময়—আব্বু।

বলো মা?

একটা কথা বলবো রাখবে আব্বু?

রাখবো মা বল?

সত্যি রাখবে তো?

কেনো আমাকে অবিশ্বাস হচ্ছে নাকি মা?

না আব্বু জানি তুমি আমার কথা রাখবে।

বল্ মা বল কি তোর কথা?

রংলাল মালিকে দেখেছো আব্বু?

রংলাল? রংলাল কে?

একটি লোক ডাক বাংলার বাগানে কাজ করে। সিমলাই এর বন্ধু।

বলো?

ছেলেটা বড় গরির।

হাঁ ওরা সবাই গরিব বটে।

আমি বলছিলাম আমাদের তো অনেক লোকের দরকার ওকে আমাদের বাসায় রাখলে কেমন হয়?

হঠাৎ রংলালকে তোর এতো মায়া হলো কেনো মা?

তুমি দেখলে ওকে চাকরী না দিয়ে পারবেনা আব্বু।

তাই নাকি? বেশ আমার সঙ্গে দেখা করতে বলিস।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আনন্দ ধ্বনি করে উঠে নীলা—আব্বু, ও এসে গেছে ডাকবো?

আমিই যাচ্ছি তোকে যেতে হবে না মা।

না আব্বু তুমি বসো আমি ডেকে আনছি......বেরিয়ে যায় নীলা।

আমির আলী সাহেব তার কন্যাকে এতো আনন্দমুখর হতে দেখেনি কোন দিন। নীলা ধীর শান্ত মেয়ে, সব সময় নিজের ওজন মেপে চলা-ফেরা

করে। অহেতুক কথা-বার্তা সে বলেনা আজ নীলাকে এতো খুশি দেখে আমির আলী সাহেব নিজেও খুশি হন।

একটু পরে রংলাল সহ ফিরে এল নীলা।

আব্বু এই যে রংলাল যার কথা তোমাকে বলেছি।

আমির আলী সাহেব রংলালের পা থেকে মাথা অবধি তাকিয়ে দেখে নিয়ে বললো—ও! তারপর একটা সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করে বললো—শিমলাই এর বন্ধু তুমি?

হাঁ মালিক।

তুমি শহরে যাবে?

বনহুর মাথা চুলকালো।

নীলা বলছে তুমি নাকি শহরে যেতে চাও?

হাঁ যাবো।

বেশ তো তা হলে আমার বাড়িতেই কাজ করবে। কি কাজ পারো তুমি?

সব কাজ পারি মালিক।

বেশ তাহলে তুমি তৈরি থেকো তোমাকে শহরে নিয়ে যাবো। প্রথমে দু'শো করে দেবো পরে মাইনে বাড়িয়ে দেবো বুঝলে?

আচ্ছা মালিক যা আপনাদের দয়া। বনহুর সেলাম করে বেরিয়ে গেলো।

নীলা বললো—ওর খুব উপকার হবে আব্বু।

আমির আলী হেসে বললো—চমৎকার চেহারা। ছোট লোকের মধ্যে এমন চেহারা দেখা যায় না।

আব্বু গরিব হলেই তারা ছোট লোক হয়না। ওরাও মানুষ কাজেই ওদের মধ্যেও মনপ্রাণ সব আছে। তোমার আমার মতই রক্তে মাংসে গড়া ওদের দেহ, কাজেই ওরাও মানুষ।

আমির আলী সাহেবের কন্যার কথায় একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললো—আমি ঠিক ছোট লোক বলিনি মা। বলেছিলাম কি এই সব নিচু ঘরেও এমন ছেলে জন্মে। যাক্ তুমি যখন বলছো ওকে একটা ভাল কাজ দেবো।

আচ্ছা আব্বু।

বনহুর রাতে বাসায় ফিরে চাচা আর সিমলাইকে ডেকে বললো—বড় সাহেব আমাকে একটা চাকরি দেবেন বলেছেন।

চাচা বললো—বড় সাহেব তোকে চাকরি দেবে?

হাঁ চাচা।

সিমলাই এর দু'চোখে বিস্ময় সে কোন কথা বলতে পারেনা, মনে মনে ভাবে সর্দার চাকরি করবে এ কেমন কথা। কিন্তু মুখে সে কিছু বলেনা।

চাচা কিন্তু খুব খুশি হয়ে পড়ে।

চাচী অদূরে কোন একটা কাজ করছিলো কথাটা তার কানে যেতেই রুখে দাঁড়ালো—কিসের চাকরি করবি রংলাল? ও চাকরি করা তো হবে না। তোকে যেতে দেবোনা আমি।

চাচা এবং সিমলাই অবাক চোখে তাকালো চাচীর মুখে। তারা বুঝতে পারলো কেনো চাচী তাকে ছাড়তে চায়না। রংলাল চলে গেলে চাচীর আর ঘুম হবে না কারণ রংলাল নাকি চাচীর গা-টিপতে ভাল পারে।

তবু এক সময় নির্জনে সিমলাই বললো—সর্দার শেষ পর্যন্ত আপনি বড় সাহেবের সঙ্গে শহরে যাবেন চাকরি করতে?

হেসে বললো বনহুর—সিমলাই প্রয়োজনে আমাকে চাকরিও করতে হবে। কিছু ভেবোনা আমি বড় সাহেবের সঙ্গে শহরে গেলে তুমি কান্দাই আস্তানায় চলে যাবে। আমি নিজেও আসবো সময় পেলে।

সর্দার নীলাভ আলোর জন্য এসেছিলেন কিন্তু কই এক দিনও তো চাচাকে এ-কথা জিজ্ঞাসা করলেন না?

চাচাকে জিজ্ঞাসা করার কোন প্রয়োজন হয়নি তাই করিনি তবে নীলাভ আলোর সন্ধান আমি পেয়েছি সিমলাই।

সর্দার!

হাঁ আমি নিজের চোখে দেখেছি যে নীলাভ আলোর কথা তুমি বলেছিলেন। আরও একটা সংবাদ শোন সিমলাই ঐ নীলাভ আলোর সঙ্গে তোমাদের বড় সাহেবের যোগাযোগ আছে এবং আমি সে কারণেই তার শহরের বাসায় চাকরি গ্রহণ করতে চাই।

সর্দার বড় সাহেব সেই নীলাভ আলোর সঙ্গে....

হাঁ। আমি প্রথমেই সন্দেহ করেছিলাম যা তাই সত্য। সিমলাই তুমি সাবধান থাকবে কোনক্রমে একথা যেন—তোমার চাচা কিংবা চাচী জানতে না পারে।

সর্দার সে ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকবেন।

এমন সময় চাচী এসে পড়ে সেখানে—সিমলাই তুই রংলালকে সর্দার বলিস?

সঙ্গে সঙ্গে বনহুর জবাব দিল—সিমলাই মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে আমাকে সর্দার বলে চাচী।

বাঃ বাঃ খুব ভাল কথা। যাক অনেকক্ষণ তোরা আরাম করলি এবার কাজে যা।

বনহুর বললো—আজ শরীরটা ভাল লাগছেনা চাচী কাজে যাবোনা।

সে কি বড় সাহেব তোকে চাকরি দেবে আর আজ কাজে যাবিনা?

না চাচী বড় খারাপ লাগছে। আজ সিমলাই যাক। সিমলাই যানা দোস্ত।

আচ্ছা আমি যাচ্ছি।

আজ সিমলাই রওয়ানা দিলো।

রংলাল এতোক্ষণও এলোনা বড় খারাপ লাগছে নীলার। কেমন যেন বাগানটা আজ খাঁ খাঁ করছে। বাগানের শোভা যেন হারিয়ে গেছে। বড় অশ্বস্তি বোধ করে নীলা।

তার নিজের ঘরে জানালাটা খুলে বসে—তাকিয়ে থাকে বাগানটার দিকে।

সিমলাই এর চাচা যখন এলো তখন নীলা বলেছিলো—রংলাল এলোনা?

চাচা বলেছিলো—বেলা বাড়লে আসবে।

কিন্তু বেলা তো অনেক বাড়লো এতক্ষণ এলোনা রংলাল। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নীলার মনের অস্থিরতা বাড়ছে যেন।

এমন সময় সিমলাই খুরপি হাতে বাগানে প্রবেশ করলো।

নীলা জানালা দিয়ে সিমলাইকে বাগানে প্রবেশ করতে দেখে তার মুখ খানা ম্লান হলো। তাড়াতাড়ি নিজের কক্ষ থেকে বেরিয়ে বাগানে প্রবেশ করলো।

সিমলাই নীলাকে দেখে লম্বা সালাম জানালো।

নীলা ব্যস্ত কণ্ঠে বললো—রংলাল এলো না?

সিমলাই বললো—রংলালের শরীর খারাপ করছে তাই আজ আসবে না।

রংলাল আসবেনা?

না মেম সাহেব। তাই আমাকে যে কাজে পাঠিয়েছে।

রংলালের শরীর কেমন খারাপ সিমলাই? জ্বর হয়নি তো?

তা ঠিক বলতে পারলাম না তবে আমার মনে হয় ওর জ্বরই হয়েছে।

কাল কিন্তু সঙ্গে করে নিয়ে আসবি।

যদি জ্বর থাকে?

তাই তো! আচ্ছা আমিই তাহলে ওকে দেখতে যাবো। নীলা চিন্তিত মনে ফিরে এলো। এবার সে নিজের কক্ষে না গিয়ে পিতার কক্ষে প্রবেশ করলো।

আমির আলী সাহেব বাইরে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন।

নীলা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে পিতাকে লক্ষ্য করে বললো—আব্বু রংলালের অসুখ হয়েছে।

তা হবেই মা। মানুষের শরীর কখন কার অসুখ হয়।

আব্বু আমি ওকে দেখতে যাবো।

পাগলি মেয়ে।

কেনো আব্বু?

আমার বাংলোর বাগানে কাজ করে একটা শ্রমিক সেনা আর তুমি হয়ে খান বাহাদুর আমির আলী কায়েসীর মেয়ে। তুমি যাবে তাকে দেখতে?

হাঁ আব্বু।

এতে আমার মান সম্মান খোয়াবে যে মা?

তা কিছু হবে না।

বেশ যেও কিন্তু আজ নয়। কাল দেখো সে আসে কিনা।

আচ্ছা আব্বু। নীলা চলে যায় তার নিজের ঘরে। কিন্তু মনটা বড় খারাপ হয়ে যায়।

নীলা পাশের কক্ষে বিষণ্ন মনে পায়চারী করে চলছে। সে নিজেই ভেবে পায় না রংলালের জন্য তার মনটা এতো অস্থির হচ্ছে কেনো। এর আগে আরও কয়েকবার সে তার আব্বুর সঙ্গে এই ফিরু গাঁও এ এসেছে—কিন্তু সে প্রায় এদিকে সেদিকে ঘুরে বেরিয়েছে। বাংলোতে নীলা কম সময়ই থাকতো আর এবার সে বাংলোর বাইরেই যায়নি কিসের আকর্ষণে সে সব সময় বাংলোতেই বসে বসে কাটায়! রংলাল একটা সাধারণ শ্রমিক ছাড়া কিছু নয় কিন্তু...নীলার যেন ওকে শ্রমিক ভাবতে ইচ্ছা হয়না।

সিমলাই সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে বললো—সর্দার আজ আপনি যাননি তার জন্য বড় সাহেবের মেয়ে বার বার আপনার কথা জিজ্ঞাসা করছিলো। কাল আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে বলেছে।

বনহুর মনে মনে হাসলো কিন্তু মুখোভাব গম্ভীর করে বললো—শরীরটা এখন আরও খারাপ লাগছে সিমলাই। কাল বুঝি যেতে পারবো না।

সে-কি সর্দার আমি যে মেম সাহেবকে কথা দিয়েছি কাল আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবো।

বলছি তো অসুখ বেশি হলে যাবো কি করে।

সিমলাই এর পর কোন কথা বলতে সাহসী হলো না।

পরদিন বনহুর কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে রইলো।

সিমলাই বললো—দোস্ত যাবি না?

কারণ চাচা চাচী দু'জনাই তখন ঘরে ছিলো।

বনহুর কাঁপতে কাঁপতে জবাব দিলো— বড্ড জ্বর এসেছে সিমলাই। তুই যা আমার আজ যাওয়া হলো না।

চাচা আর সিমলাই ডাক বাংলোর দিকে পা বাড়ালো।

ওরা চলে যাবার পর বনহুর গা থেকে কম্বল ছুড়ে ফেলে উঠে বসলো— চাচী যেতে দাও কাঠ কাটতে যাবো।

সে-কিরে রংলাল তোর না জ্বর হয়েছে। কাঠ কাটতে যাবি কি করে? চাচীর গলায় দরদ ঝরে পড়ে।

বনহুর বলে—জ্বর ছেড়ে গেছে চাচী।

তবে বাংলোয় গেলিনা কেনো?

চাচী বড় সাহেবের মেয়েটা কেমন যেন কটমট করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে । আমার বড্ড ভয় করে।

চাচী রংলালের কথায় হেসে খুন, বলে—বড় সাহেবের মেয়ে তোর দিকে কটমট করে তাকিয়ে থাকে?

হাঁ চাচী।

তুই পুরুষ মানুষ তোর আবার ভয় কিরে রংলাল?

কি জানি কোনো যেন ভয় লাগে।

বড্ড বোকা ছেলে তুই। জানিস বড় সাহেবের মেয়ের কত টাকা।

টাকা আছে তো আমার কি চাচী?

তোকে চাকরি দেবে—দু'শো টাকা মাইনে দেবে। এটা কম কথা হলো। আমি বলছি কোন ভয় নেই তোর কাল কিন্তু যেতে হবে তোকে।

কিন্তু চাচী......

কোন কিন্তু নেই।

আজ কাঠ কাটতে যাবো না?

না। তুই কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাক বাছা। চাচী এসে বনহুরকে শুইয়ে দিয়ে কম্বল চাপা দেয়।

বনহুর তো হেসেই খুন, সর্বনাশ চাচী জর ছেড়ে গেছে। দেখছো না কেমন গা ঘামছে......

তুই বললি আর হলো। কম্বল গায়ে একটু ঘুমা আমি নিম পাতা ছেঁচে রস আনি। এক গেলাস নিম পাতার রস খেলে সব অসুখ সেরে যাবে।

চাচী...সব জ্বর ছেড়ে গেছে চাচী। চাচী......

ততক্ষণে চাচী কাঠের সিড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেলো। একটা লম্বা লগ্নি হাতে নিম গাছের ডাল ভাংতে শুরু করে দিয়েছে। রংলালের ডাক তার কানে পৌঁছায় না।

চাচীর কান্ড দেখে বনহুরের চক্ষুস্থির। সে কোন পথে পালাবে ভেবে পায় না। ঘরের কোন থেকে কুড়োলটা তুলে নিয়ে সিড়ি বেয়ে নেমে এলো নিচে তারপর পা টিপে টিপে পালালো।

ওদিকে চাচী নিম পাতা পেড়ে নিয়ে মস্ত এক গেলাস রস তৈরি করে ঘরে যায়—ওরে রংলাল। বাছা রংলাল......

একি রংলাল কোথায়। শূন্য বিছানা পড়ে আছে। চাচী তাড়াতাড়ি কাঠের দাওয়ায় এসে দাঁড়ায় তার কানে এখন ভেসে আসে ঘোড়ার খুরের শব্দ। ছুটে আসে চাচী ঘরে যেখানে কুড়োল ছিলো সেখানে কুড়োলটা নেই। এবার চাচী বুঝতে পারে রংলাল বনে কাঠ কাটতে গেছে।

❑

সিমলাই আর চাচাকে দেখে নীলা দড়বড় এগিয়ে আসে। দু'চোখে তার ব্যাকুলতা, ব্যস্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করে সে—রংলাল এলো না?

জবাব দেয় চাচা—না মেম সাহেব।

কেনো?

তার জ্বর বেশি হয়েছে।

জ্বর বেশি হয়েছে?

হাঁ মেম সাহেব।

নীলার মুখখানা অত্যন্ত ম্লান বিষণ্ন হয়ে পড়ে। তার আব্বুর কক্ষে প্রবেশ করে বলে—আব্বু রংলালের জ্বর বেশি হয়েছে। আজ একটু সময় করে ওকে দেখে আসবো কেমন?

আচ্ছা যাবে যখন তখন যাও।

নীলা খুশি হয়ে বেরিয়ে গেলো। একটু পরে ফিরে এলো আব্বু গাড়ি নিয়ে যাবো?

হাঁ তাই যাও।

নীলা গাড়িতে বসে ডাকলো—সিমলাই তুই আয় আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবি।

সিমলাই অগত্যা বাগানের কাজ রেখে এসে দাঁড়ালো গাড়ির পাশে।

নীলা দরজা খুলে বললো—উঠে আয়।

সিমলাই সঙ্কোচিতভাবে গাড়িতে উঠে বসলো।

নীলা নিজে ড্রাইভ করে এগিয়ে যাচ্ছে।

পথ চিনে দিচ্ছে সিমলাই।

আঁকা বাঁকা পাথুরিয়া পথ। কোথাও একটু জল আর ছোট ছোট পাথরের নুড়ি। গাড়িটা একটু আছাড় খেয়ে খেয়ে চলছিলো।

বেশিক্ষণ লাগলো না সিমলাইদের বাড়ি পৌঁছতে।

গাড়ির শব্দ শুনে বেরিয়ে এলো চাচী।

নীলা গাড়ি থেকে নেমে পড়তেই সিমলাই নেমে তার চাচীকে জিজ্ঞাসা করলো—চাচী আমাদের মেম সাহেব। রংলালকে দেখতে এসেছেন।

নীলা বললো—রংলাল কেমন আছে দেখতে এলাম। কোথায় সে?

চাচী তো হতবাক কি জবাব দেবে সে। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো।

সিমলাই বললো—আসুন মেম সাহেব রংলাল ঘরে আছে।

নীলা সিড়ির কাঠে পা রাখতেই চাচী বলে উঠলো—রংলাল কি ঘরে আছে। সে বনে কাঠ কাটতে গেছে। ঐ দেখনা আমি নিম পাতার রস করে রেখেছি এলে খাইয়ে দিবো।

সিমলাই আর নীলা তাকিয়ে দেখলো ও পাশে দাওয়ায় মস্ত এক গেলাস সবুজ রং এর রস রয়েছে। শিউরে উঠলো সিমলাই কারণ সে জানে জ্বর হলে চাচীর কাছে নিস্তার নেই নিম পাতার এক গেলাস রস রোজ সকাল আর সন্ধ্যায় খেতে হবে।

কিন্তু পরক্ষণেই সিমলাই বলে উঠলো—রংলাল কাঠ কাটতে বনে গেছে?

হাঁ।

নীলার মুখমণ্ডল গম্ভীর হলো, সে বিস্ময় ভরা গলায় বললো—জ্বর নিয়ে রংলাল বনে গেছে কাঠ কাটতে! এরপর আর সে দাঁড়ালোনা। নিজের গাড়িতে উঠে বসলো।

সন্ধ্যার পূর্বেই বনহুর ফিরে এলো বাড়িতে।

সঙ্গে সঙ্গে সিমলাই বলে উঠলো—সর্দার মেম সাহেব এসেছিলো আপনাকে দেখতে।

চাচী বা চাচা তখন ছিলো না তাই সিমলাই সর্দারকে কুর্ণিশ জানিয়ে সসম্মানে কথাগুলো বললো।

বনহুর ঘোড়া থেকে নেমে কাঠের বোঝাটা নামাতে নামাতে বললো—মেম সাহেব! কোন মেম সাহেব সিমলাই?

বড় সাহেবের মেয়ে নীলা।

নীলা এসেছিলো আমাকে দেখতে?

হঠাৎ অট্ট হাসিতে ভেংগে পড়ে বনহুর। এ হাসি সিমলাই এর কাছে অতি পরিচিত। তাই সে নীরবে মাথা নিচু করে থাকে।

সেই দিন গভীর রাতে বনহুর তার পুটলি নিয়ে বেরিয়ে এলো বাইরে।

চাচা আজ ডিউটিতে যায়নি তাই সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়েছে। সিমলাই আর চাচীও ঘুমাচ্ছে।

বনহুর বাইরে এসে পুটলি খুলে পরে নিলো তার দস্যু ড্রেস। অদূরে তাজ দাঁড়িয়ে প্রভূর জন্য অপেক্ষা করছে।

বাংলোর অদূরে এসে বনহুর নেমে দাঁড়ালো। প্রাচীর টপ্‌কে বাংলোর উঠানে প্রবেশ করলো বনহুর।

ওদিকে খান বাহাদুর আমির আলীর কক্ষের আলো জ্বলছে।

বনহুর সন্তর্পনে সেই কক্ষের পাশে এসে দাঁড়ালো। জানালার ফাঁকে নজর পড়তেই দেখলো একটা বাক্সের পাশে দাঁড়ায়ে খান বাহাদুর কি যেন করছে। বাক্সটা ঐ বাক্স, যে বাক্সটা সেদিন সেই অদ্ভুত গাড়িখানা থেকে সাদা চামড়া লোকটা নামিয়ে দিয়েছিলো।

বাক্সটার মধ্যে কি আছে বোঝা গেলনা। তবে বাক্সটার ঢাকনির ফাঁকে নীলাভ আলো দেখা যাচ্ছিলো।

বনহুর শুনতে পেলো একট কণ্ঠ-স্বর, ঐ বাক্সটার পাশে একটা ওয়্যার-লেস ধরনের যন্ত্রও নজরে পড়লো তার।

হঠাৎ আলো নীভে গেলো কক্ষের।

বনহুর আর কোন কিছু দেখতে পাচ্ছে না। তবে নীলাভ আলোকরশ্মি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আর শুনতে পাচ্ছে একটা গম্ভীর কণ্ঠস্বর।

চমকে উঠলো বনহুর; এই শব্দই সে একদিন তার ট্রান্সমিটার সাউন্ড বক্সে শুনতে পেয়েছিলো। সাংকেতিক কথা-বার্তা, বুঝবার যো নেই।

বনহুর তার ছোট্ট টেপরেকর্ড বের করে চালু করে দিলো। সাংকেতিক কথাগুলো টেপ হয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে কথা বলছে আমির আলী কায়েসী।

বনহুর কথার মানে বুঝতে না পারলেও এটা বুঝলো যার সঙ্গে কথা হচ্ছে আমির আলী সাহেব তাকে অত্যন্ত সমিহ্ করে চলে। কারণ তার গলার-স্বর অত্যন্ত নরম ছিলো।

মাত্র কয়েক মিনিট কথা হলো।

কক্ষমধ্যে আলো জ্বলে উঠার সঙ্গে সঙ্গে বনহুর সরে দাঁড়ালো। এগিয়ে গেলো সে নীলার কক্ষের পাশে। কক্ষমধ্যে ডিম লাইট জ্বলছে।

বনহুর শার্শী খুলে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করলো। নীলার গলার লকেটে একটি নীল উজ্জ্বল পাথর ঝক ঝক করছিলো। বনহুর মালা ছড়ার লকেটে একটি ছোট কাগজের টুকরো আটকে দিলো তারপর বেরিয়ে এলো বাইরে।

ভোরে নীলার ঘুম ভাংতেই প্রথমে তার নজরে পড়লো নিজের গলার মালার লকেট। চমকে উঠলো নীলা। এক টুকরো কাগজ আটকানো রয়েছে। কে এই কাগজ তার গলার লকেটে আটকে দিয়েছে। তাড়াতাড়ি কাগজখানা খুলে হাতে নিয়ে মেলে ধরলো, সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট ধ্বনি করে উঠে, "দস্যু বনহুর। "-নীলা কাগজখানা আবার পড়লো তাতে লেখা আছে—নীলা নিজের মনকে সংযত করো।

—দস্যু বনহুর।

স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে নীলা, হাতের তালুতে সেই ছোট্ট কাগজের টুকরা। ভাবে নীলা তার এই বদ্ধ ঘরে দস্যু বনহুর এসেছিলো তাহলে। দস্যু বনহুরের নাম সে শুনেছে। আরও শুনেছে তার অসাধ্য কোন কাজ নেই। আব্বুকে এ কাগজ দেখাবে কি? না তা হয়না দস্যু বনহুর তার মনকে সংযত করতে বলেছে। সে কি করে জানলো তার মনের কথা। নীলা যত ভাবছে ততই যেন অস্থির হয়ে পড়ে।

কাগজের টুকরাখানা নীলা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দিলো বাইরে।

এমন সময় দেখলো রংলাল আর সিমলাই ডাক বাংলোর বাগানে প্রবেশ করছে।

পূর্বাকাশে সোনালী সূর্য সবেমাত্র উঁকি দিয়েছে। জানালার পাশে দুর্বাশিরে শিশির বিন্দুগুলো সোনালী আলো মুক্তোর মত ঝক মক করছে। নীলার মনটা দপ করে খুশিতে ভরে উঠে। ভুলে যায় নীলা একটু আগে সেই ছোট্ট এক লাইন লেখাটার কথা।

নীলা নিজকে সংযত রাখতে পারে না সে বেরিয়ে আসে তার কক্ষ থেকে। গাড়ি বারান্দার সিড়ি বেয়ে নিচে এসে দাঁড়ায়। ডাকে নীলা—রংলাল।

সবেমাত্র কাজে মনোযোগ দিতে যাচ্ছিলো বনহুর, নীলার ডাকে ফিরে তাকায়।

ভোরের সূর্যের আলো নীলার কণ্ঠে নীল পাথরটা দীপ্ত উজ্জ্বল লাগছিলো। বনহুর দেখলো তার সঙ্গে নীলার চোখ দুটোও যেন দীপ্ত হয়ে উঠেছে।

বনহুর মৃদু হাসলো তারপর একটা সুন্দর গোলাপ তুলে নিয়ে এগিয়ে এলো—নিন।

নীলার মুখে অফুরন্ত খুশি ঝরে পড়ছে, তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে ফুলটা নিয়ে নাকে ধরলো তারপর বললো—রংলাল তোমার নাকি অসুখ হয়েছিল?

হাঁ মেম সাহেব।

কাল তোমায় দেখতে গিয়েছিলাম......

আমাকে আপনি দেখতে গিয়েছিলেন মেম সহেব।

হাঁ। কিন্তু তুমি তো ছিলে না। আচ্ছা রংলাল তুমি কেমন লোক বলোতো অসুখ নিয়ে বনে গিয়েছিলে কাঠ কাটতে?

কি করবো, গরিব মানুষ কাঠ না কাটলে খাবো কি?

নীলার চোখ দু'টো ছল ছল করে উঠে। নীলা বলে—রংলাল আমি তো বলেছি তোমাকে চাকরি দেবো।

হাঁ আপনি সে কথা বলেছেন মেম সাহেব।

তাহলে তুমি এখন থেকেই ডাক বাংলোয় থেকে যাও না কেনো?

তা হয় না মেম সাহেব।

তুমি যাবে না আমাদের সঙ্গে?

যাবো কিন্তু যতদিন আপনারা এখানে থাকবেন ততদিন আমি বাড়ি থেকেই কাজ করবো। এবার যাই মেম সাহেব?

আচ্ছা যাও।

রংলাল চলে গেল তার কাজে।

নীলা নিজের কক্ষে এসে জানালার পাশে একটা বই নিয়ে বসলো। ওখান থেকে রংলাল যেখানে কাজ করে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো।

হঠাৎ রংলালের দৃষ্টি এক সময় চলে যায় জানালাটার দিকে; দেখতে পায় দুটো চোখ তার দিকে তাকিয়ে আছে।

রংলালের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হতেই নীলা দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। আবার তাকায় সে তার হাতের বই খানার দিকে।

বনহুরের ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠে। কাজের ফাঁকে তাকিয়ে দেখে নেয় সে তার শ্রমিক ড্রেসটার দিকে। ঢিলা কুঁচি দেওয়া কাবলি পাজামা, ঢিলা পাঞ্জাবী, মাথায় গামছা বাধা। খালি পা, পায়ে কাদামাটির সঙ্গে একগাদা ঘাসের কুচি লেগে রয়েছে। ভোরের শিশির ভেজা অনেকটা পথ এসেছে সে তাই কাদা আর ঘাস পা দু'খানাকে লেপটে রেখেছে।

আর দু'টো দিন কেটে যায় এমনি করে।

প্রতিদিন আমির আলী সাহেব এ-গ্রাম সে-গ্রাম দেখতে বেরিয়ে যান। প্রজাদের সুখ সাচ্ছন্দ দেখেন এবং খোঁজখবর নেন। অন্যান্য দিনের মত আজও আমির আলী তার গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

নীলাকে অবশ্য যাবার জন্য বললেন আমির আলী। আজও নীলা অস্বীকার করলো।

হেসে গাড়িতে চেপে বসেলেন তিনি।

নীলা পিতাকে বিদায় সম্ভাষণ জানালো।

গাড়িখানা বেরিয়ে যেতেই নীলা এগিয়ে এলো বাগানের পাশে। ডাকলো—রংলাল।

বনহুর লক্ষ্য করছিলো নীলার কার্যকলাপ।

নীলা ডাকতেই বললো বনহুর—ডাকছেন মেম সাহেব?

হাঁ, শোন।

বনহুর উঠে এলো বাগানের কাজ রেখে।

নীলা বললো—রংলাল, ঐ যে ঝর্ণা দেখছো ওখানে যাবে?

কাজ আছে মেম সাহেব।

থাক্। চলো আমার সঙ্গে।

সিমলাইকে নিয়ে যান......

না—তুমিই চলো।

অগত্যা বনহুর পা বাড়ালো।

নীলা এগুচ্ছে আগে আগে পিছনে বনহুর।

নীলার পরনে আজও নীল শাড়ি। কানে নীল পাথরের দুল। কপালে নীলাভ টিপ। পায়ে নীল জুতো। ধীরে ধীরে এগুচ্ছিলো নীলা।

এক সময় বললো নীলা—রংলাল!

বলুন মেম সাহেব।

তুমি লেখাপড়া শিখবে?

হাসলো বনহুর—গরিব দুঃখীদের আবার লেখাপড়া কি মেম সাহেব? শরীর খাটিয়ে যা পয়সা পাই তাই দিয়ে সংসার চলে।

রংলাল, আমি তোমাকে লেখাপড়া শেখাবো।

সত্যি বলছেন?

হাঁ। শিখবে?

শিখবো।

ঝর্ণার পাশে এসে দাঁড়ায় নীলা।

বনহুর একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকে।

নীলা বলে—ভারী সুন্দর।

হাঁ, মেম সাহেব।

বলো তো কি ভারী সুন্দর?

ঐ নীল আকাশ।

নীলা তাকালো বনহুরের মুখের দিকে। একটু হেসে বললো—নীল আকাশ তোমাকে মুগ্ধ করে রংলাল।

হাঁ, মেম সহেব। ঐ নীল আকাশ আমার খুব ভাললাগে।

আর ঐ ঝর্ণা?

তাও সুন্দর।
রংলাল—সবচেয়ে সুন্দর তুমি।
মেম সাহেব!
হাঁ, রংলাল।
মেম সাহেব আপনি আমাকে সুন্দর বলছেন?
কেনো?
আজ পর্যন্ত কেউ আমাকে সুন্দর বলেনি, সবাই আমাকে কুৎসিত বলে।
খিল খিল করে হেসে উঠে নীলা—রংলাল, তুমি কুৎসিত?
হাঁ, মেম সাহেব।
আয়নায় নিজের মুখ দেখেছো কোনদিন?
ঘাড় চুলকে বলে বনহুর—আয়না। আয়না কোথায় পাব?
আচ্ছা—আমার ঘরে বড় আয়না আছে, ওতে তুমি নিজের চেহারাটা দেখবে তাহলেই বুঝতে পরবে কত সুন্দর তুমি।
বনহুর মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে কোন জবাব দেয় না।
নীলা বলে—রংলাল, তোমার মাকে তুমি খুব ভালবাসো?
খুব ভালবাসী মেম সাহেব। মা ছাড়া আর কাকেই বা ভালবাসবো।
মা ছাড়া আর কাউকে ভালবাসোনি রংলাল?
আবার হাসলো বনহুর—এ অধমের ভালবাসা কে নেবে মেম সাহেব? সামান্য মাইনের চাকরি করি কেইবা আমাকে ভালবাসবে।
রংলাল!
বলুন মেম সাহেব?
না না চলো, এবার বাংলোয় ফিরে যাই?
চলুন।
হঠাৎ নীলার মুখমন্ডল গম্ভীর হলো, বললো—রংলাল, তুমি দস্যু বনহুরকে চেনো?
মুখমণ্ডলে ভীত-ভাব এনে বলে বনহুর—দস্যু বনহুর?
হাঁ।
নাম শুনেছি কিন্তু আজও চোখে দেখিনি মেম সাহেব।
খুব ভয়ঙ্কর দস্যু না?
শুনেছি তাই......
জানো রংলাল ঐ দস্যু আজ বাংলোয় এসেছিলো?
চমকে উঠলো যেন বনহুর—বলেন কি মেম সাহেব?
হাঁ রংলাল। আমার গলার লকেটে সে একটা চিঠি আটকে রেখে গেছে।
চিঠি! আপনার গলার লকেটে বলেন কি মেম সাহেব?

হাঁ রংলাল। কিন্তু আশ্চর্য সে দস্যু ডাকু অথচ আমার গলায় যে মালাটা রয়েছে এর পাথরের দাম অনেক—অনেক টাকা তবু সে এ মালা ছিড়ে বা খুলে নেয়নি। যেমন এসেছিলো তেমনি চলে গেছে......

মেম সাহেব আপনি বললেন দস্যু বনহুর নাকি আপনার গলার লকেটে একটা চিঠি আটকে রেখে গেছে?

হাঁ রংলাল।

কি লিখা ছিলো মেম সাহেব তাতে?

ও তুমি বুঝবেনা রংলাল।

হাঁ আমি তো আর লেখাপড়া জানিনা মেম সাহেব। আচ্ছা মেম সাহেব চিঠিখানা বড় সাহেবকে দেখিয়েছেন?

না। ওটা তোমাকেই শুধু বললাম রংলাল।

তাহলে বড় সাহেবেকে চিঠি দেখাননি বা বলেন নি মেম সাহেব?

না দরকার হয়নি।

দস্যু বনহুর আপনার গলার লকেটে চিঠি আটকে রেখে গেলো অথচ আপনি তা বললেন না?

তুমি বুঝবে না রংলাল।

চিঠিটা কি করেছেন?

ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি।

হঠাৎ বনহুর হেসে উঠলো।

ফিরে তাকালো নীলা ওর মুখের দিকে তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বললো হাসলে কেন রংলাল?

মাফ করবেন—মেম সাহেব। আমার বড্ড হাসি পেয়েছিলো।

এমন সময় একটা আর্তচিৎকার শোনা যায়।

এক সঙ্গে ফিরে তাকায় বনহুর আর নীলা।

তারা দেখতে পায় একটা বুনো ষাঁড় জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসেছে। সে তাড়া করে নিয়ে চলেছে একটা সাঁওতাল যুবককে।

এ দৃশ্য লক্ষ্য করে অনেকগুলো লোক আর্তচীৎকার করছে। কারণ আর একটু হলেই ষাঁড়টা ঐ যুবককে শিং-এর আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলবে। মারা পড়বে যুবকটা, তাতে কোনো সন্দেহ নাই।

যুবকটা উঠি পড়ি করে প্রাণপণে ছুটে আসছে। ষাঁড়টা তার পিছনে তাড়া করে আসছে।

গাঁয়ের লোকগুলো ছুটছে তাদের পিছনে পিছনে।

যুবকটী রংলালকে দেখে সেই দিকে ছুটে আসতে লাগলো।

নীলার মুখ কালো হয়ে উঠেছে। ভীত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে সে।

অতি নিকটে এসে পড়েছে যুবকটা।

ষাঁড়টা সামান্য দূরে।

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে করে যুবকটির দিকে এগিয়ে গেলো। যুবকটি জড়িয়ে ধরলো বনহুরকে—ভাই রংলাল বাঁচাও......বাঁচাও......

ঠিক্ সেই সময় ষাঁড়টা একেবারে কাছে এসে পড়েছে।

বনহুর যুবকটিকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে ষাঁড়টার শিং দুটো চেপে ধরলো বলিষ্ঠ হাত দু'খানা দিয়ে। এতো জোরে বনহুর এঁটে ধরলো যার জন্য ষাঁড় মাথাটা উঁচু করতে পারছিলো না। ষাঁড় পিছনে-পা দুখানা দিয়ে মাটি খুঁড়তে লাগলো।

নীলা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলো। রংলালের সঙ্গে পেরে উঠছে না বলিষ্ঠ ষাঁড়টা।

ততক্ষণে চারিদিকে বহু লোকজন জমে গেছে।

বনহুরের সঙ্গে ষাঁড়টা পেরে উঠলো না।

একজন লোক দড়ি ছুড়ে দিলো—আর দু'জন দু'পাশ থেকে ষাঁড়কে মজবুত করে বেঁধে ফেললো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ষাঁড়টাকে বন্দী করে ফেললো। এবার সবাই বনহুরকে জড়িয়ে ধরে আনন্দ করতে শুরু করেছে।

অদ্ভুত এ দৃশ্য?

নীলার যেন বিশ্বাসই হচ্ছেনা—রংলাল একটা বুনো ষাঁড়কে এভাবে কাবু করে ফেললো কি করে।

যুবকটি তখনও থর থর করে কাঁপছে।

আর একটু তা হলেই বুনো ষাঁড়টা তার দেহটাকে ক্ষতবিক্ষত করে হত্যা করতো। বনহুরের পা জড়িয়ে ধরলো যুবকটা। ভাই তুমি আমাকে বাঁচালে।

অন্যান্য লোকগুলো ষাঁড়টাকে বেঁধে ফেলেছে। সবার চোখে কৃতজ্ঞতা।

বনহুর বললো—চলুন মেম সাহেব।

নীলা দু'চোখে বিস্ময় নিয়ে অভিভূতের মত তাকিয়ে আছে। রংলালের মধ্যে যে এক অদ্ভুত পৌরুষত্ব ভাব দেখতে পেয়েছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে যা নেই।

নীলা বললো—চলো।

ফিরে এলো নীলা আর বনহুর।

নীলা কি বলে যে হৃদয়ের আবেগ জানাবে ভেবে পায় না। রংলাল যদি কোন ভদ্র সমাজের মানুষ হতো নীলা তাকে অফুরন্ত ধন্যবাদ জানাতো।

খান বাহাদুর আমির আলী বাংলোয় ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে নীলা রংলালের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলো। আব্বু—জানো রংলাল আজ কি করেছে?

হেসে বললো আমির আলী—আমি কেমন করে জানবো মা।

নীলা দু'চোখ বিস্ফারিত করে বললো—জানো আব্বু আজ আমি ঝর্ণার ধারে বেড়াতে গিয়েছিলাম, রংলালকে সঙ্গে নিয়েছিলাম হঠাৎ বিপদ আপদ হয় এজন্য।

খুব ভালই করেছিলে নীলা, বুদ্ধিমানের কাজ করেছিলে। কারণ এসব জঙ্গলে জায়গায় কখন কি বিপদ আপদ ঘটে কে জানে।

শোন আব্বু—শুনলে তুমিও শিউরে উঠবে।

বল্ মা বল্ শুনি?

নীলা বলে চলে—জানো আব্বু, আমি ঝর্ণার ধারে দাঁড়িয়ে ঝর্ণার অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগ করছিলাম। ঠিক ঐ সময় একটি তীব্র আর্ত চিৎকারে ফিরে তাকাই, দেখতে পাই সেকি ভীষণ আকার একটা বুনো ষাঁড় একটি সাঁওতাল যুবককে তাড়া করে নিয়ে আসছে, তার পিছনে পিছনে একদল লোক ছুটে আসছে কিন্তু কেউ বুনো ষাঁড়টির কবল থেকে সেই যুবকটিকে উদ্ধার করতে সাহসী হচ্ছেনা। আর একটু তা হলেই যুবকটিকে শেষ করে ফেলে আর কি। ষাঁড়টা একেবারে যুবকের কাছাকাছি এসে পড়েছে, যুবকটি তখন দিশেহারার মত আমাদের দিকে দৌড়ে আসছে।

সর্বনাশ! তারপর? বললেন আমির আলী সাহেব।

নীলা বলে চলে—তারপর যুবকটি একেবারে আমাদের কাছাকাছি এসে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে ষাঁড়টাও। ঠিক ওই মুহূর্তে রংলাল যুবকটিকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ষাঁড়টার শিং দুটো চেপে ধরলো। আশ্চর্য আব্বু রংলাল ষাঁড়ের শিং দুটো দু'হাতে এমন জোরে চেপে ধরলো যার জন্য ষাঁড়টা একচুল আর নড়তে পারলো না।

সত্যি বলছিস মা?

হাঁ আব্বু।

রংলাল তাহলে অনেক শক্তি রাখে! এমনি তেজদীপ্ত বলিষ্ঠ ছেলে যদি ভদ্রঘরে জন্মাতো তাহলে......

কেনো ওরা কি মানুষ নয়?

তা বলছিনা। বলছি ভাল ঘরে এমন ছেলে জন্মালে তার দ্বারা সমাজের অনেক কাজ হতো।

আব্বু রংলালও মানুষ। রংলালকে দিয়ে কেনো সমাজের কাজ হবেনা? আমাদের শরীরে যেমন রক্ত মাংস তেমনি রংলালের দেহেও......

আমি ঠিক তা বলছিনা মা।

জানি তুমি যা বলছো। বেশ ওকে আমি লেখাপড়া শেখাবো। দেখো ও একদিন তোমার আমার মত সভ্য জগতের মানুষ হয় কিনা।

ঐ সময় বনহুর এসে দাঁড়ালো—মেম সাহেব, এই দেখুন আপনার গলার মালাটা বাইরে পড়েছিলো।

বিস্ময়ে তাকালো নীলা এবং সঙ্গে সঙ্গে গলায় হাত দিয়ে বললো—তাইতো!

আমির আলী সাহেবের চোখে মুখেও বিস্ময় ঝড়ে পড়ছে, মালাটা দেখে নয়—মালাটা রংলাল হাতে পেয়েও আত্নসাৎ করেনি, সে দিতে এসেছে। আমির আলী সাহেবের মুখটা দীপ্ত উজ্জল হয়ে উঠলো। তিনি সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে একশত টাকার দু'খানা নোট বের করে বাড়িয়ে ধরলেন—নাও, তোমার বিশ্বস্ততার পুরস্কার।

বনহুর নীলার হাতে মালাটা দিয়ে বললো—মালিক, পুরস্কার আমি চাইনা। মালাটা আমি পেয়েছিলাম বলেই দিলাম, এটাই আমার আনন্দ।

বেরিয়ে গেল রংলাল।

দু'চোখে বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে রইলেন আমির আলী সাহেব রংলালের চলে যাওয়া পথের দিকে। কিছুক্ষণ তিনি কথাই বলতে পারলেন না। একটা সামান্য শ্রমিক-এর মধ্যে এমন একটা বলিষ্ঠ মনোভাব তাকে শুধু আশ্চর্যই করলো না মুগ্ধ করলো তাকে।

পরদিন আমির আলী সাহেব শহরে ফেরার জন্য নীলাকে প্রস্তুত হতে বললেন। আরও বললেন তিনি—শোন নীলা, রংলালকে বলবে সে যেন তৈরি হয়ে সকালে চলে আসে।

নীলার দু'চোখে আনন্দ ফুটে উঠে।

রংলাল তাদের সঙ্গে শহরে যাবে এ যেন তার কাছে বড় খুশির কথা। নীলা চলে এলো বাগানে যেখানে বনহুর কাজ করছিলো। বেলা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে তাই সে দ্রুত হাত চালাচ্ছিলো।

নীলা এসে ডাকলো—রংলাল।

বলুন মেম সাহেব?

কাল সকাল সকাল চলে আসবে কিন্তু। কাল আব্বু শহরে ফিরবেন। আসবে তো?

আসবো।

নীলা খুশি মনে চলে যায়।

গভীর রাত।

নীলার ঘুম আসছেনা। বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করছে। আজ রাতটা কাটলেই তারা শহরের পথে রওয়ানা দেবে। রংলাল যাবে তাদের সঙ্গে । সব-সময় থাকবে সে তার পাশে পাশে। নীলা ওকে লেখাপড়া শেখাবে। ওকে ভদ্র সমাজে ভদ্রভাবে বাঁচার অধিকার দেবে। রংলালের মুখখানা বার বার তার মানস পটে ভেসে উঠছে। ওকে তার কেনো এতো ভাল লাগে। ......

হঠাৎ নীলার চিন্তাধারায় বাধা পড়ে। কে যেন আলগোছে তার ঘরের জানালা পথে মেঝেতে লাফিয়ে নেমে পড়লো।

কক্ষে ডিম লাইট জ্বলছে।

ডিম লাইটের আলোতে নীলা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে একটা জমকালো মূর্তি তার কক্ষের মেঝেতে এসে দাঁড়িয়েছে।

নীলা যেন আড়ষ্ট-হয়ে যায়। শুনেছে দস্যু বনহুরের দেহে জমকালো ড্রেস পরা থাকে। এই তাহলে দস্যু বনহুর। শিউরে উঠে নীলা, ভয় কম্পিত কণ্ঠে বলে উঠে—কে? কে তুমি?

দস্যু বনহুর!

তুমি—তুমি আবার এসেছো?

হাঁ।

কি চাও তুমি?

কিছু না।

তবে কেন এসেছো?

একটি কথা বলতে। নীলা তোমাকে সাবধান করে দিয়েছি তুমি নিজেকে সংযত করবে কিন্তু তুমি তা করোনি।

আমি ঠিক্ তোমার কথা বুঝতে পারছিনা?

তা পারবে না। কারণ তুমি এখন নিজের কাছে নিজেই পরাজিত। ভেবে দেখো যা করছো তা সভ্য সমাজের জন্য অশোভনীয়।

না না তুমি জানোনা। আমার মন যাকে চায় সেই তো আমার......

ছিঃ ছিঃ এ তুমি কি বলছো নীলা?

যা সত্যি তাই বলছি। আমি রংলালকে মন প্রাণে......

—ভালবাসো? এই তো?

হাঁ।

কিন্তু সে একটা শ্রমিক—একটা মজুর মাত্র......

হোক, সে মানুষ।

নীলা!

তুমি আমার নাম জানলে কি করে?

দস্যু বনহুরের অজানা কিছু নেই।

সত্যি তুমি আশ্চর্য!

কারণ?

তুমি একজন ডাকু—একজন দস্যু তুমি ,তবু তোমার মহান চরিত্রের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তুমি সেদিন রাতে আমার কক্ষে প্রবেশ করেও আমার কোন ক্ষতি করোনি। ইচ্ছা করলে তুমি আমার সবকিছু হরণ করতে পারতে।

কেমন করে জানলে সেদিন তোমায় রেহাই দিয়েছি বলে আজও দেবো?

এবার নীলার বুকটা ধক করে উঠলো। এতোক্ষণ যে সাহস নিয়ে নীলা কথা বলছিলো দপ্ করে সে মনোবল নিভে গেলো। আমতা আমতা করে বললো—যা চাও তাই দেবো, তুমি চলে যাও দস্যু বনহুর।

যদি বলি তোমাকেই চাই—

তা হতে পারেনা। আমি চিৎকার করবো।

আমি তোমার আব্বাকে সব কথা জানিয়ে দেবো। তিনি যদি জানতে পারেন তুমি রংলালকে মনপ্রাণে ভালবাসো তাহলে তার পরিণতি কি হবে জানো? রংলালকে চিরদিনের জন্য তোমার কাছ থেকে সরিয়ে ফেলা হবে। কোনদিন আর তার দেখাও পাবেনা......

না না, তা হয় না। আমি সত্যি করে বলছি ওকে ভালবেসে ফেলেছি। তুমি কেনো—কেনো আমার কাছ থেকে ওকে ছিনিয়ে নিতে চাও? বল তুমি কি চাও—কত টাকা চাও, আমি তাই দেবো। আমার এ মালা ছড়া তোমাকে দিচ্ছি, তুমি চলে যাও আর কোনদিন তুমি এসো না। নীলা নিজের গলার মালাছড়া খুলে নিয়ে জমকালো মূর্তির দিকে ছুড়ে দেয়—যাও। যাও দস্যু বনহুর আর তুমি এসো না।

বেশ আমি যাচ্ছি কিন্তু মনে রেখো নীলা তুমি যা করছো, মোটেই তা সমীচীন নয়। জমকালো মূর্তি মালাছড়া পকেটে রেখে যে পথে কক্ষে প্রবেশ করেছিলো সেই পথে বেরিয়ে যায়।

নীলা বিছানার উপরে যেমন বসেছিলো তেমনি বসে থাকে একটি পুতুলের মত।

বার বার নীলার কানের কাছে জমকালো মূর্তির কথাগুলো প্রতিধ্বনিত হয়......বেশ আমি যাচ্ছি কিন্তু মনে রেখো নীলা তুমি যা করছো মোটেই সমীচীন নয়......

সমস্ত রাত অনিদ্রায় কাটলো নীলার। ভোরে তার চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে। কেমন যেন বিষণ্ন ক্লান্ত লাগছে তাকে। তবু তার মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, বারবার তাকাচ্ছে সে জানালা দিয়ে অদূরস্থ পাথুরিয়া পথটার দিকে।

আমির আলী সাহেব একবার এসে বলে গেছেন—মা, তৈরি হয়ে নাও। বেলা দশটার মধ্যেই আমরা রওয়ানা দেবো।

নীলার শরীরটা আজ যেন উঠতেই চাচ্ছেনা। বাবুর্চি এসে বলে গেলো—আপামনি, টেবিলে চা নাস্তা দেওয়া হয়েছে।

তবু নীলার গ্রাহ্য নেই।

শেষ পর্যন্ত খান বাহাদুর আমির আলী সাহেব নিজে এসে ডাকলেন—মা নীলা, এসো চা ঠান্ডা হয়ে গেলো যে।

আসছি আব্বু।

পিতার সঙ্গে চা নাস্তার টেবিলে এসে বসলো নীলা।

আমির আলী সাহেব কন্যার প্লেটে দু'খানা পরোটা উঠিয়ে দিতেই নীলা বলে উঠলো—না আব্বু একখানা দাও।

কেনো মা আজ অমন করছিস কেনো?

খিদে নেই আব্বু।

আচ্ছা নীলা চোখ দুটো তোর বড্ড লাল হয়ে উঠেছে। রাতে বুঝি ঘুম হয়নি?

না আব্বু ও কিছু না। অনেক ঘুমিয়েছি। খেতে খেতে জবাব দিলো নীলা।

আমির আলী সাহেব কন্যার জন্য একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি পুনরায় বললেন—শরীর খারাপ করেনি তো মা?

না আব্বু। তুমি খাও, আমার কিছু হয়নি। ঠিক ঐ মুহূর্তে জানালা পথে অদূরে রংলালকে দেখা যায়। চাচা আর সিমলাই তার সঙ্গে এসেছে।

নীলার মুখখানা দীপ্ত উজ্জল হয়ে উঠে, বলে সে—আব্বু রংলাল এসে গেছে।

হাঁ মা, আমি ওর কথাই মনে করছিলাম। ছেলাটা সত্যিই বড় ভাল। যেমন সাহসী শক্তিশালী তেমনি বিশ্বাসী।

আব্বু তোমার ওকে ভাল লাগে?

হাঁ মা। তাছাড়া সে শুধু সেদিন ঐ সাঁওতাল যুবকটিরই জীবন রক্ষা করেনি, তোকেও সে বাঁচিয়েছে কারণ যুবকটিকে আহত করে তোকেও আক্রমণ করতো ষাঁড়টা তাতে কোনো ভুল নাই।

ঠিক বলেছো আব্বু। সেদিন ও না থাকলে কি যে হতো কে জানে। আব্বু তুমি খাও আমার খাওয়া হয়ে গেছে। নীলা খাওয়া শেষ করে উঠে পড়ে।

আমির আলী সাহেব ব্যস্তকণ্ঠে বলেন—সে কি মা কিচ্ছু খেলে না তো?

অনেক খেয়েছি আব্বু। বেরিয়ে যায় নীলা।

বাংলোর বারান্দায় এসে দাঁড়ায় নীলা, হাত নেড়ে ডাকে—রংলাল এদিকে এসো। সিমলাই এর চাচা সিমলাই তোমরাও এসো।

সবাই ওরা এসে দাঁড়ালো বাংলোর বারান্দার পাশে। সালাম জানালো তারা নীলাকে।

নীলা বললো—রংলাল তুমি তৈরি তো?

হাঁ মেম সাহেব। একটু হেসে জবাব দিলো বনহুর।

নীলার কাছে ওর হাসিটা বড় ভাল লাগে। চোখ দুটো যেন ফিরিয়ে নিতে পারে না! তবু দৃষ্টি সরিয়ে নিতে হয়! রংলাল ভাববে কি।

খান বাহাদুর সাহেব চুরুট ঠোঁটে বেরিয়ে আসেন।

নীলা বলে—আব্বু ও এসেছে। চলো এবার আমরা রওয়ানা দি।

হাঁ মা চলো। কিহে রংলাল যাবেতো আমাদের সঙ্গে?

যাবো মালিক। বললো বনহুর।

চাচা বললো—মালিক কোনদিন শহরে যায়নি একটু দেখবেন।

তোকে আর বলতে হবেনা। হেসে বললেন আমির আলী সাহেব।

বাবুর্চি তার জিনিসপত্র গাড়িতে উঠিয়ে নিলো।

আমির আলী সাহেব বললেন—এবার তোমরা সবাই গাড়িতে চেপে বসো। ড্রাইভ আসনে চেপে বসলেন তিনি।

এবার ফিরু ডাক বাংলা থেকে বিদায় নিলো ওরা।

চাচা এবং সিমলাই দাঁড়িয়ে রইলো।

সিমলাই-এর সঙ্গে বনহুরের সব কথা হয়ে গেছে। তাজকে নিয়ে ফিরে যাবে সে কান্দাই।

অবশ্য ক'দিনের মধ্যেই বনহুর কান্দাই তার আস্তানায় আসবে বলে দিয়েছে।

গাড়িখানা চলে গেলো—চাচা এবং সিমলাই ফিরে চললো বাড়ির পথে।

❑

রংলালকে নিয়ে নীলার অপূর্ব এক অনুভূতি। নীলা যেন ওকে সর্বক্ষণ নাগপাশের মত ঘিরে থাকতে চায়। ওকে যতই দেখে ততই যেন সে মুগ্ধ বিস্মিত হয়।

শহরে আসার পর বনহুরও বেশি হাবা বনে যায়। এত বড় বাড়ি এতো ঐশ্বর্য্য সে যেন দেখেনি কোনদিন। অবাক হয় এসব দেখে।

নীলা বলে—রংলাল আজ তোমার বই কিনে এনেছি তোমাকে লেখাপড়া শিখতে হবে।

বনহুর খুশি হয়ে, মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানায় সে লেখাপড়া শিখবে।

এক সময় বলে নীলা—রংলাল তোমার জন্য পাজামা পাঞ্জাবী তৈরি করে দেবো। পরবে তো?

পরবো।

নীলা সেই দিনই তাদের নিজস্ব দর্জ্জিকে ডেকে বনহুরের জন্য ভাল দামী কাপড়ের পাজামা আর পাঞ্জাবী তৈরির অর্ডার দিলো।

পরদিনই এসে পড়লো অর্ডারের পাজামা আর পাঞ্জাবী। নীলা বনহুরের নিজের হাতে পাঞ্জাবী পরিয়ে দিয়ে বললো—বাঃ কি সুন্দর লাগছে। যাও এবার পাশের ঘরে গিয়ে পাজামা পরে এসো।

বনহুর পাজামা হাতে চলে গেলো পাশের ঘরে।

নীলা ওর জন্য প্রতিক্ষা করতে লাগলো।

পাজামা পাঞ্জাবী পরে অপূর্ব সুন্দর মানিয়েছে বনহুরকে। নীলা সহসা দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারেনা ওর দিক থেকে।

বনহুরও কিন্তু অবাক চোখে নীলার মুখে তাকিয়ে থাকে। ওর দৃষ্টির কাছে নীলার চোখ দুটো নত হয়ে আসে আপনা আপনি। বেরিয়ে যায় সে নিজের ঘরে।

হাসে বনহুর। নীলার সরল সহজ মনের কাছে নিজকে অপরাধী বলে মনে হয়। নীলা তাকে মনপ্রাণে ভাল বেসে ফেলেছে। সেই ভালবাসার বিনিময়ে তার সঙ্গে তাকে করতে হচ্ছে ছলনা। কিন্তু সে যে নিরুপায়। এ ছাড়া খান বাহাদুর আমির আলীর সঙ্গলাভের আশা কম। আমীর আলী সাহেব যে এই হত্যা রহস্যের সঙ্গে জড়িত আছে তাতে কোন সন্দেহ নাই। নিশ্চয়ই কান্দাই পর্বত মালার সেই নিলাভ আলোর সঙ্গে যোগাযোগ আছে আমির আলীর। শুধু নিলাভ আলোকরশ্মিই নয় এ হত্যা রহস্যের মূল ঘাটি তাকে খুঁজে বের করতে হবে।

সন্ধ্যার পূর্বে বনহুর বাগানে পানি দিচ্ছিলো।

নীলা যেয়ে দাঁড়ালো তার পাশে—রংলাল।

বলুন মেম সাহেব?

আজ থেকে তুমি আর বাগানে কাজ করবে না।

সেকি মেম সাহেব?

হাঁ আমাদের পুরোন মালিই সব করবে।

আমি তাহলে কি করবো?

যা করতে হয় আমিই বলে দেবো।

এমন সময় আমির আলী সাহেব এসে দাঁড়ালেন হেসে বললেন তিনি—রংলাল তুমি আমার সঙ্গে থাকবে। নীলা মা তোমাকে লেখাপড়া শিখিয়ে দেবে।

বনহুর মাথা নিচু করে রইলো।

নীলা বললো—আব্বু ওর পাজামা পাঞ্জাবী করে দিয়েছি।

হাঁ দেখ্‌ছি ভারী সুন্দর হয়েছে। বললেন আমির আলী সাহেব। তারপর চলে গেলেন তিনি নিজের কক্ষে।

নীলা বললো—চলো এখন পড়বে চলো।

আচ্ছা বলুন মেম সাহেব।

মেম সাহেব নয়—আপামনি বলবে।

মাথা কাৎ করে সম্মতি জানালো—আচ্ছা বলবো।

নীলার পিছু পিছু এগোয় বনহুর।

হল ঘর পেরিয়ে একটি সুসজ্জিত ঘর। এই ঘরে এসে দাঁড়ালো নীলা।

বনহুর তখনও পর্দার ওপারে দাঁড়িয়েছিলো।

নীলা ডাকলো—রংলাল ভিতরে এসো।

বনহুর অতি সঙ্কোচিতভাবে পর্দা সরিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলো।

নীলা বললো—বসো।

বনহুর তো অবাক, সে কি করে মেম সাহেবের সামনে চেয়ারে বসবে। দাঁড়িয়ে থাকে রংলাল।

নীলা পুনরায় বলে—বসো। এই চেয়ারখানায় বসো।

বনহুর নীলার পায়ের কাছে মাটিতে বসে পড়ে।

নীলা চেয়ারে বসে বই মেলে ধরে—এই নাও পড়ো।

বনহুর খুশিতে উচ্ছল হয়ে বইখানা নীলার হাত থেকে নিয়ে মেঝের কার্পেটে মেলে ধরে।

নীলা উবু হয়ে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়—বলো অ, আ, ই, ঈ...

বনহুর নীলার সঙ্গে সঙ্গে শব্দগুলো উচ্চারণ করে চলে।

বাঃ চমৎকার হচ্ছে। বললো নীলা।

বনহুর বললো—আজ এই পর্যন্ত থাক মেম সাহেব?

আবার মেম সাহেব। বলো আপামনি।

আপামনি আজ......

আর পড়বেনা এই তো?

হাঁ।

কাল কিন্তু পুরো এক ঘন্টা পড়তে হবে।

আচ্ছা আপামনি।

রংলাল?

বলুন?

পড়া-শোনা ভাল লাগে?

খুব।

রোজ সকাল আর সন্ধ্যায় আমি তোমাকে পড়াবো।

আচ্ছা। বনহুর বই হাতে উঠে দাঁড়ালো।

রংলাল তুমি এ কামরাতেই ঘুমাবে। আব্বু বলেছে তোমার জন্য এ কামরা ছেড়ে দেওয়া হলো।

বনহুর তবু দরজার দিকে পা বাড়াচ্ছিলো।

নীলা বললো—তুমি যাচ্ছো কোথায়? আজ থেকে এ ঘর তোমার। আমি যাচ্ছি......

নীলা বনহুরের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বেরিয়ে যায়।

বনহুর ওর চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসে।

এবার বনহুর কক্ষটার চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। বড় লোকের রুচীসম্মত সাজানো ঘরখানা। এক পাশে একটা খাট। খাটে স্প্রিং এর গদির উপরে ভেলভেটের বিছানা। নরম তুলতুলে এক জোড়া বালিশ। বালিশে মূল্যবান কভার। চাদরে বুটি তোলা ভেলভেটের ফুল। খাটের পাশে একটা টেবিল, টেবিলে একটা ফুলদানি। ফুলদানিতে সদ্য রাখা এক থোকা গোলাপ। পাশে দু'খানা চেয়ার। মেঝেতে কার্পেট বিছানো রয়েছে। দেয়ালে কোন ছবি নেই, শুধু একটা দেয়াল ঘড়ি টিক্ টিক্ করে বেজে চলেছে।

বনহুর বিছানায় না-শুয়ে মেঝেতে কার্পেটে শুয়ে হাতখানা মাথার নিচে রাখলো। ভাবছে অনেক কথা। কখন যে নিজের অজ্ঞাতে ঘুমিয়ে পড়েছে খেয়াল নাই বনহুরের।

হঠাৎ ঘুম ভেংগে গেলো কিন্তু চোখ মেললো না সে। কেউ যেন তার মাথার নিচে বালিশ গুঁজে দিচ্ছে। অতি সন্তর্পনে বালিশ দিয়ে আবার চাদর এনে আলগোছে বিছিয়ে দিলো তার সারা দেহের উপর।

বনহুর চোখ মেলে দেখলো নীলা।

আরামে চোখ দুটো মুদে আসছে একটু নড়লো না সে ইচ্ছা করেই। যেমন নিঃশব্দে নীলা তার কক্ষে প্রবেশ করেছিলো তেমনি নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলো।

❑

রাত যখন তিনটা।

সমস্ত কান্দাই শহর ঘুমে অচেতন।

বনহুর তার শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালো। নিঃশব্দে প্রবেশ করলো সিড়ি ঘরের নিচে ছোট্ট ঘরখানায়। একটু পরে বেরিয়ে এলো তার শরীরে জমকালো ড্রেস। মাথার পাগড়ীর নিচের অংশ দিয়ে বনহুরের মুখের নিচের অংশ ঢাকা। কোমরের বেল্টে পিস্তল এবং এক পাশে ছোরা। পায়ে বুট।

অতি সন্তর্পনে পিছন পাইপ বেয়ে উঠে গেলো উপরে। যে কক্ষে আমির আলী সাহেব অঘোরে ঘুমাচ্ছেন সেই কক্ষে প্রবেশ করলো বনহুর জানালার শার্শী খুলে।

বুটের শব্দে হঠাৎ ঘুম ভেংগে গেল আমির আলী সাহেবের। চোখ রগড়ে তাকাতেই শিউরে উঠলেন তিনি। কম্পিত কণ্ঠে বললেন—কে?

বনহুর কোন জবাব না দিয়ে আমির আলীর শয্যার পাশে এসে দাঁড়ালো। দক্ষিণ হস্তে তার উদ্যত রিভলভার।

বনহুর সম্মুখস্থ চেয়ারে একখানা পা তুলে দাঁড়ালো গম্ভীরকণ্ঠে বললো—আমি—যম!

যম।

হাঁ। খান বাহাদুর সাহেব আপনার কাজ কতদূর হলো জানতে এসেছি।

কাজ! কিসের কাজ?

রক্ত আর চক্ষু পাচার ব্যবসায় কতদূর অগ্রসর হয়েছেন?

এ সব তুমি কি বলছো? কে তুমি?

আমি যা জিজ্ঞাসা করছি তার জবাব দিন।

না। না আমি ওসব কিছু জানি না।

তা হলে মরতে চান? আমার হতে এটা কি জানেন? একটুও শব্দ হবে না অথচ আপনার রক্তাক্ত দেহটা পড়ে থাকবে আপনার দুগ্ধ ফেনিল শয্যার উপরে। আপনার মৃত্যুর পর আপনার একমাত্র আদরিনী কন্যার অবস্থার কথা স্মরণ করে আমার কাছে সব কথা খুলে বলুন।

না না আমি কিচ্ছু জানি না।

আমির আলী সাহেব আপনি জানেন না?

না।

ডাঃ রায় আমার হাত থেকে নিস্তার পায়নি খান বাহাদুর সাহেব আপনিও পাবেন না...

ডাঃ রায় এর কথায় খান বাহাদুর আমির আলী সাহেবের মুখমন্ডল ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো। আমতা আমতা করে বললো—ডাঃ রায়। কে ডাঃ রায়—আমি—আমি তাকে চিনি না।

এবার বনহুর হেসে উঠলো অদ্ভুতভাবে তারপর বললো—আপনি চেনেন না ডাঃ রায়কে? যার জন্য আপনাদের ঘাটিগুলো অকেজো হয়ে পড়েছে? যার জন্য আপনাদের ব্যবসা অচল হবার পথে? ডাঃ রায়কে আমিই পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছি।

তুমি—তুমি দস্যু বনহুর?

এতোক্ষণে তা হলে চিনতে পেরেছেন? খান বাহাদুর সাহেব ডাঃ রায়কে হত্যা না করলেও আপনাকে আমি ক্ষমা করবো না। তবে আপনি যদি আপনাদের ঘাটির সন্ধান আমাকে জানান তাহলে...

ঠিক এই মুহূর্তে টেবিলে ফোনটা বেজে উঠলো সশব্দে।

বনহুর তাকালো ফোনটার দিকে।

খান বাহাদুর হাত বাড়িয়ে দিলেন।

বনহুর তার পূর্বে নিজেই তুলে নিলো রিসিভারটা।

ওপাশ থেকে ভেসে এলো একটা গুরুগম্ভীর গলা...আগামী অমাবস্যা রাত তিনটায় জঙ্গলবাড়ি ঘাটিতে আসবে...জরুরি দরকার আছে...ডাঃ রায় কাঠ গড়ায় উঠার পূর্বে তাকে...পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে...খান সাহেব...। বনহুর এবার রিসিভারটা খান বাহাদুর সাহেবের মুখের কাছে ধরে বলে—বলুন হ্যালো, বলুন।

এবার খান বাহাদুর আমির আলী কম্পিত কণ্ঠে বললেন—হ্যালো হ্যালো—বলুন—

পরক্ষণেই রিসিভার বনহুর নিজের কানে চেপে ধরলো।

ওপাশ থেকে ভেসে এলো অমাবস্যার দিন ভোর রাতেই তুমি রওয়ানা দেবে...হাঁ আরও একটি কথা মনে রাখবে আমির আলী। নীলাকে সঙ্গে আনবে—নীলাকে তুমি যেদিন আমার হাতে তুলে দেবে...মনে আছে নিশ্চয়ই তোমার একথা—খান বাহাদুর..খান বাহাদুর......

বনহুর রিসিভারটা দ্রুত হস্তে পুনরায় আমির আলীর মুখের কাছে তুলে ধরলো—বলুন আছে। বলুন আছে....

আমির আলী তখন ঘেমে নেয়ে উঠেছেন, তিনি বললেন—আছে ...আছে...

সরিয়ে নিলো আবার রিসিভার খানা বনহুর আমির আলীর মুখের কাছ থেকে তারপর কানে রেখে শুনতে চেষ্টা করলো। ওদিকের সেই গুরু গম্ভীর কণ্ঠস্বর—নীলা তোমার মেয়ে নয় তবু আমার হাতে তাকে তুলে দিতে

তোমার এতো দ্বিধা কেনো জানি না...বয়স আমার হয়েছে তাই বলে নীলা সুখী হবে না একথা তুমি ভেবো না আমির আলী...নীলাকে একবার কোনক্রমে কৌশলে আমার হতে তুলে দাও আমি যেমন করে হোক তাকে বাগিয়ে নেবো...হাঁ সব কথার শেষ কথা তুমি আগামী অমাবস্যার রাত তিনটায় জঙ্গলবাড়ি ঘাটিতে নীলা সহ আমার সঙ্গে দেখা করবে...বনহুর. আবার ক্ষিপ্রতার সঙ্গে রিসিভারখানা আমির আলীর মুখে চেপে ধরলো—বলুন আচ্ছা, বলনু...

আমির আলী বললেন—আচ্ছা...

এরপর বনহুর তার রিসিভার কানে দিয়েই টেবিলে রাখলো কারণ ও পাশের কথা শেষ হয়ে গিয়েছিলো।

এবার বনহুর তার পিস্তল আমির আলী সাহেবের বুকে চেপে ধরে বললো—আমি কয়েকটা প্রশ্ন করবো সঠিক জবাব দেবেন, না হলে মৃত্যু অনিবার্য। দেখুন প্রাণের চেয়ে এ পৃথিবীতে কোনটাই প্রিয় নয়। যতক্ষণ বেঁচে থাকবেন ততক্ষণ লাভ তারপর সব কিছু মূল্যহীন। খান বাহাদুর আমার এক নম্বর প্রশ্ন হলো নীলা কার মেয়ে? বলুন জবাব দিন?

আমির আলী সাহেবের মুখমন্ডল বিবর্ণ হয়ে উঠলো। তিনি কোন জবাব না দিয়ে বনহুরের চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বনহুর বললো—ভয় নেই আমির আলী সাহেব—নীলা আমার বন্ধু ডাঃ রায় এর মেয়ে...

বনহুর বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো—নীলা ডাঃ রায়-এর কন্যা।

হাঁ। নীলা ডাঃ রায়-এর কন্যা হলেও আমি তার পিতার মত। শিশুকালে ডাঃ রায় নীলাকে আমার হাতে সমর্পণ করেছেন।

কারণ—?

নীলার জন্ম রহস্যময়—।

নীলার জন্ম রহস্যময় সে কেমন?

অনেক কথা আছে।

বেশি কথা শোনার সময় আমার নেই সংক্ষেপে বলুন। আর সত্য কথা বলবেন এক বর্ণ কিছু মিথ্যা বললে আপনার রক্তাক্ত দেহটা বিছানায় লুটিয়ে পড়বে। আমির আলী সাহেব নীলার জন্ম কাহিনী শোনার পূর্বে আমি আমার অন্য প্রশ্নের জবাব শুনতে চাই। বলুন জঙ্গল বাড়ি কে আছে, যে একটু পূর্বে আপনার নীলাকে পাওয়ার জন্য আগ্রহশীল?

আমি—জানিনা......

আবার মিথ্যা কথা? বনহুর তার পিস্তল খানা আমির আলী সাহেবের বুকে চেপে ধরে।

আঁতকে উঠে আমির আলী সাহেব, জীবনে তিনি এমন বিপদে পড়েননি। এতোদিন তিনি দস্যু বনহুর সম্বন্ধে শুনেই এসেছিলেন আজ তাঁকে একেবারে স্বচক্ষে দেখলেন শুধু তাই নয় জবাবদিহি করতে হচ্ছে তার প্রশ্নের। দস্যু বনহুর তাকে এই দণ্ডে হত্যাও করতে পারে। মৃত্যুকে আমির আলী সাহেব বড় ভয় করেন। এবার তিনি না বলে পারলেননা, বললেন—তুমি যার কণ্ঠ একটু পূর্বে শুনলে তিনি আমাদের দলপতি!

নাম কি তার?

নাম—নাম......

হাঁ বলুন তার নাম কি?

নাম ডক্টর হামবার্ট চাটার্জি।

হামবার্ট চাটার্জি?

হাঁ।

বাঙ্গালীর নাম—হামবার্ট মানে?

আসলে তিনি বাঙ্গালীও নয় অবাঙ্গালীও নয় তিনি বিদেশী, ভাল বাঙ্গলা জানেন.....

থামলেন কেনো বলুন?

না না আমি এর বেশি বলতে পারবোনা।

বলতে হবে। দাঁতে দাঁত পিষে বললো বনহুর।

আমির আলী সাহেব বললেন—কান্দাই পর্বতমালায় জঙ্গলবাড়ি নামে আমাদের একটা ঘাঁটি আছে......

হাঁ আমি জানি। বলনু?

সেখানেই থাকেন হামবার্ট।

বুঝলাম।

নীলাকে তিনি বিয়ে করতে চান......

হাঁ শুনলাম। খান বাহাদুর সাহেব আগামী অমাবস্যায় জঙ্গল বাড়ি নীলাসহ আপনার আমন্ত্রণ আছে। কাজেই আপনি তৈরি থাকবেন। আমি ঐ দিন ফিরুগাঁও ডাক বাংলোয় আপনার সঙ্গে মিলিত হবো। কিন্তু মনে রাখবেন আপনি যদি এ কথা কোনক্রমে কাউকে জানান তাহলে দস্যু বনহুর আপনাকে ক্ষমা করবেনা। হাঁ এবার বলুন নীলার জন্ম কাহিনী?

কিন্তু......

হাত ঘড়ি দেখে নেয় বনহুর—আর কয়েক মিনিট আমি এ কক্ষে অপেক্ষা করবো, বলুন?

কিন্তু নীলা যদি জানতে পারেন এসব কথা?

হাসলো বনহুর—নীলা আজ না জানলেও একদিন জানবে খান বাহাদুর সাহেব। তার জন্ম কাহিনী—আপনি কোনক্রমে গোপন রাখতে পারবেন না তার কাছে।

নীলা জন্ম গ্রহণ করার পরক্ষণেই ডাঃ রায় নীলার জননীকে হত্যা করেছিলো।

হত্যা করেছিলো ডাঃ রায় নীলার মাকে?

হ্যাঁ।

ডাঃ রায় তাহলে স্ত্রীর হত্যাকারী?

না। নীলার মা তার স্ত্রী নয়।

নীলার মা ডাঃ রায়ের স্ত্রী নয়?

না।

তাহলে আপনি বললেন নীলা ডাঃ রায়-এর কন্যা?

হ্যাঁ। নীলা ডাঃ রায় এর কন্যা।

তবে?

নীলার মা একটি মজুরের অবিবাহিতা কন্যা......

ও এবার বুঝেছি।

তারপর নীলাকে গোপনে ডাঃ রায় আমাকে দিয়ে দেন তার সঙ্গে দেন একটি নীল বহু মূল্যবান পাথর। যে নীল বিক্রয় করে আমি আজ খান বাহাদুর আমির আলী। আজ আমি কোটি কোটি টাকার মালিক। নীলাই আমার সৌভাগ্য। না না নীলাকে আমি কোনদিন দূরে সরাতে পারবোনা। ও আমার মেয়ের চেয়েও বড় বেশি আদরের। ওকে ছাড়া আমি এক মুহূর্ত বাঁচতে পারবোনা। নীলা আমার জীবন......

ঐ মুহূর্তে বাইরে কারো পদশব্দ শোনা যায়।

বনহুর বলে উঠে—আমির আলী সাহেব মনে রাখবেন এর একটি কথা প্রকাশ পেলে আপনার মৃত্যু—কথা শেষ করে বেরিয়ে যায় বনহুর।

পিছন পাইপ বেয়ে সে নেমে আসে নিচে।

পাহারাদার প্রতি রাতেই দুই একবার খান বাহাদুর আমির আলী সাহেবের কক্ষের বারান্দায় ঘুরে যায়—কারণ কোন শত্রু যেন প্রবেশ করতে না পারে।

ভোরে নীলাই প্রথম পিতার কক্ষে প্রবেশ করে।

আমির আলী সাহেব যেন আড়ষ্ট হয়ে গেছেন। তিনি কক্ষের মেঝেতে একটি সোফায় স্থির হয়ে বসে আছেন। আজ তার চোখ দু'টো লালে লাল হয়ে উঠেছে। নীলা কক্ষে প্রবেশ করে বললো—আব্বু তুমি আজ বাগানে যাওনি?

না মা।

কেনো আব্বু? প্রশ্ন করে নীলা।

খান বাহাদুর সাহেবের একটা অভ্যাস আছে তিনি ভোরে শয্যা ত্যাগ করেই সর্বপ্রথম বাগানে যান। কিছুক্ষণ বাগানের মুক্ত বাতাসে পায়চারী করেন তারপর ফিরে এসে চা-নাস্তা পান করেন।

আজ যেন এসবের ব্যতিক্রম।

নীলা তাই অবাক হয়ে পিতার কক্ষে প্রবেশ করে জিজ্ঞাসা করলো।

জবাব দিলেন আমির আলী সাহেব—আজ শরীরটা বড় ভাল নেই মা।

সেকি আব্বু শরীরটা আবার খারাপ হলো? দেখি জ্বর হয়নি তো? নীলা আমির আলীর মাথায় কপালে হাত রাখে।

আমির আলী সাহেবের মনে তখন প্রচন্ড ঝড় বয়ে চলেছে। রাতের সেই দৃশ্যটা এখনও ভাসছে তাঁর চোখের সামনে। সেই জমকালো মূর্তি। সেই বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। সেই তেজোদীপ্ত উজ্জল দৃষ্টি চোখ।

নীলা পিতার মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়, তার আব্বুকে সে এমন হতভম্ব নির্বাক হতে দেখেনি কোনদিন। বলে নীলা—কি ভাবছো আব্বু? মাথা তো বেশ ঠান্ডা বলে মনে হচ্ছে?

হাঁ মা জ্বর নেই।

তবে ঘরে চুপ করে বসে আছো কেনো?

কিছু না।

এমন সময় রংলাল বেড-টি সহ সংবাদপত্র নিয়ে সেই কক্ষে প্রবেশ করে—মালিক বেড-টি।

নীলা বলে উঠে—রংলাল, বয় কোথায়?

আপামনি বয়েব্র অসুখ তাই......রংলাল টেবিলে চায়ের কাপ এবং টি পট্ গুলো নামিয়ে রাখে।

নীলা চা তৈরি করে পিতার হাতে দেয়।

রংলাল সংবাদ পত্র খানা টেবিলের পাশে ভাঁজ করে রাখে, তারপর বেরিয়ে যাচ্ছিলো।

নীলা বলে—রংলাল আমার ঘরে এক কাপ চা দিও।

আচ্ছা আপামনি। বেরিয়ে যায় রংলাল।

নীলা এবার নিজের ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ে। একখানা বই নিয়ে মেলে ধরে চোখের সম্মুখে।

একটু পরে রংলাল্ ট্রের উপর চায়ের-কাপ সহ প্রবেশ করে।

পদশব্দ শুনেও নীলা চোখ তোলেনা।

রংলাল নীলার বিছানার পাশে এসে দাঁড়ায়। একটু কেশে বলে—আপামনি চা।

নীলা গম্ভীর কণ্ঠে বলে—টেবিলে রাখো।

রংলাল টেবিলে চায়ের-কাপ রেখে বেরিয়ে যাচ্ছিলো।

নীলা ডাকে—শোন।

রংলাল থমেকে দাঁড়ায়—আমায় ডাকছেন আপামনি?

হাঁ শোন।

এগিয়ে আসে রংলাল।

নীলা তাকায় ওর চোখের দিকে—তোমাকে বলেছি বয়-এর কাজ বা মালির কাজ তুমি আর করবে না।

তাহলে কি করবো?

আব্বুর সঙ্গে তার গবেষণাগারে কাজ করবে।

গবেষণাগার?

হাঁ সেখানে তুমি থাকবে আব্বু বলেছেন।

গবেষণাগার কেমন আপামনি? বাগানের মত সুন্দর বুঝি?

তুমি বড্ড বোকা রংলাল। না তোমার নামটা পাল্টাতে হবে। রংলাল বড় বিশ্রি নাম কিন্তু......আচ্ছা তোমাকে যদি মনির বলে ডাকি?

রংলাল যেন চমকে উঠলো তারপর বললো—যা আপনার ভাললাগে তাই বলে ডাকবেন।

আজ থেকে তোমাকে মনির বলে ডাকবো। এ নামটা আমার খুব পছন্দ। আচ্ছা মনির?

বলুন আপামনি?

তুমি এরি মধ্যে একটি বই শেষ করে ফেলেছো। আগামী সপ্তাহে তোমাকে আরও একটি নতুন বই এনে দেবো। আচ্ছা মনির?

বলুন?

তুমি গাড়ি চালানো শিখবে?

শিখবো কিন্তু কে আমাকে শেখাবে?

আমি তোমাকে গাড়ি চালানো শেখাবো। তুমি আমার গাড়ির চালক মানে ড্রাইভার হবে।

খুব-ভাল হবে আপামনি।

কাল থেকে আমি তোমাকে জাহাঙ্গীর মাঠে নিয়ে যাবো। সেখানে বিরাট মাঠ দু'চার দিনেই তুমি গাড়ি চালানো শিখবে।

❑

বনহুরের পাশে বসে নীলা গাড়ি চালানো শেখায়। এমনি করে হ্যান্ডেল ধরতে হয়, এমনি করে ব্রেক করতে হয়। বনহুরের ইচ্ছা না থাকলেও তাকে বাধ্য হয়ে গাড়ি চালানো শেখার অভিনয় করতে হয়। নীলার কোমল হাতের ছোঁয়া বনহুরের বলিষ্ঠ হাতের মুঠায় শিহরণ জাগায়। ভাল লাগে কোমল কণ্ঠের ধমকগুলো—তুমি বড্ড বোকা এতো করে বলছি এমনি করে হ্যান্ডেল ধরতে হয়...নাও ধরো......

নীলা বনহুরের হাত দু'খানা সহ গাড়ির হ্যান্ডেল চেপে ধরলো।

গাড়ি এগিয়ে চলেছে।

খুশি হয় নীলা—বাঃ বাঃ চমৎকার।

আজ আর নয় আপামনি আবার কাল হবে।

মনির?

বলুন?

গাড়ি চালাতে তোমার কেমন লাগছে?

খুব ভাল।

সত্যি?

হাঁ আপামনি।

নীলা বলে—থাক তাহলে আজ, কাল সকালে আবার হবে।

তাই থাক আপামনি। বলে বনহুর।

বাসায় ফিরে নিজের হাতে বনহুরকে সাজিয়ে দেয় নীলা। আজ পাজামা পাঞ্জাবী নয় আজ সুট প্যান্ট টাই। নিজের হাতে নীলা টাই বেঁধে দেয় ওর গলায়।

নিস্পলক-নয়নে তাকিয়ে থাকে নীলা বনহুরের দিকে।

বনহুর বলে—আপামনি আমার বড্ড লজ্জা করছে।

লজ্জা! কেনো?

এসব পোশাক পরে আমি বাইরে যাবোনা কিন্তু।

ও এই লজ্জা?

হাঁ আপামনি?।

বাইরে তোমার যেতে হবেনা শুধু আমি তোমায় দেখবো। আর সেজন্যই আমি এ পোশাক নিয়ে এসেছি।

নীলা! হঠাৎ বনহুরের মুখ দিয়ে শব্দটা উচ্চারণ হয়ে পড়ে।

মুহূর্তে নীলার চোখ দু'টো দীপ্ত উজ্জল হয়ে উঠে। ওর কোটের সম্মুখ ভাগ চেপে ধরে বললো—ডাকো আর একবার নীলা বলে ডাকো......

মাফ্ করবেন আপামনি......আমি—আমি ভুল করে......

না তুমি আমাকে এখন থেকে নীলা বলেই ডাকবে।

না না তা হয়না আমি একজন......

তোমাকে আমি আমার মনের মত করে গড়িয়ে নেবো মনির।

তা হয়না আপামনি। আমি মূর্খ, আমি গরিব আমি একজন শ্রমিক......

তুমি একজন মানুষ এই তো তোমার আসল পরিচয়। আমি তোমাকে ভালবাসি মনির।

আপামনি......

নীলা ওর মুখে হাত-চাপা দেয়—না না তুমি আমাকে নীলা বলে ডাকো। অপূর্ব তোমার কণ্ঠ-মনির!

নীলা দু'হাতে বনহুরের হাত দু'খানা চেপে ধরে ব্যাকুল গলায় বলে—বলো কোনদিন তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাবেনা? বলো জবাব দাও মনির?

বনহুর হতবাক হয়ে যায়, সে জানতো এমনি একটা অবস্থা একদিন আসবে এজন্যই সে রাতের অন্ধকারে নিজ মূর্তি ধারণ করে নীলাকে সাবধান করে দিয়েছে তবু তাকে সংযত করা সম্ভব হলোনা। কি জবাব দিবে বনহুর ভেবে পায়না। এজন্যে সে প্রস্তুত ছিলো না তখন।

নীলা বলে—চুপ করে আছো কেনো মনির? বলো!

আমার মা আছে তার কাছে আমার যেতে হবে। ......

তোমার মাকে আমি আমাদের এখানে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করবো। তবু তুমি কথা দাও আমাকে ছেড়ে যাবেনা কোনদিন?

বেশ যাবো না। বনহুর কোট খুলে ফেললো, টাইটাও খুলে রাখলো তারপর চলে গলো পাশের কক্ষে। যখন সে বেরিয়ে এলো তখন তার দেহে পাজামা আর পাঞ্জাবী শোভা পাচ্ছে।

নীলা বললো—যাও বাগানে কাজ করোগে।

বনহুর বুঝতে পারলো নীলা তার আচরণে খুশি হয়নি। মাথানিচু করে বেরিয়ে গেলো বনহুর।

বাগানে এসে ফুল গাছগুলোর গোড়া পরিষ্কার করতে শুরু করলো বনহুর।

নীলা কখন তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

বনহুর বুঝতেই পারেনি।

নীলা ডাকলো—মনির?

বনহুর তখন অন্য কোন চিন্তায় বিভোর ছিলো। নীলার কণ্ঠস্বর তার কাছে ঠিক মনিরার কণ্ঠ বলে মনে হলো। চমকে ফিরে তাকালো তুমি। না না আপামনি আপনি......

মনির আবার তুমি বাগানের কাজে এসেছো?
আপনি তো বললেন আপামনি?
উঠে এসো। উঠো বলছি......
বনহুর বাধ্য ছাত্রের মত মাথা নিচু করে উঠে দাঁড়ালো।
নীলা বললো—এসো।
বনহুর তাকে অনুসরণ করলো।
নীলা গাড়ির পাশে এসে দাঁড়ালো, ড্রাইভ আসনের পাশের দরজা খুলে ধরে বললো—উঠো।
বনহুর যন্ত্র চালিতের মত নীলার আদেশ পালন করলো।
এবার নীলা ড্রাইভ আসনে বসে গাড়িতে ষ্টার্ট দিলো।
নীলার হাতে গাড়িখানা তীরবেগে ছুটতে লাগলো।
বনহুর পাশে বসে আছে স্থির হয়ে। চুলগুলো তার এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে আছে ললাটের চার পাশে। পাঞ্জাবীর বোতাম খোলা থাকায় তার লোমভরা প্রশস্ত বুকের কিছু অংশ দেখা যাচ্ছিলো। পা দু'খানা সম্পূর্ণ খালি কোন জুতো ছিলোনা।
নীলাও নিশ্চুপ গাড়ি চালিয়ে চলেছে। দৃষ্টি-তার সম্মুখে।
এক সময় বললো নীলা—বোবা বনে গেছো নাকি?
এ্যাঁ!
চমকে উঠলে যে?
বলুন আপামনি?
কি ভাবছো অমন করে?
এ্যাঁ?
কি ভাবছিলে সঠিক জবাব দেবে?
আপনার কথা ভাবছিলাম।
নীলা ফিরে তাকায়—আমার কথা তুমি ভাবছিলে?
হাঁ আপামনি।
কি ভাবছিলে?
ভাবছিলাম আপনি আমাকে কত ভালবাসেন।
কেনো তুমি আমাকে ভালবাসোনা মনির?
আমি—আমি হাঁ বাসি......
সত্যি এটা তোমার মনের কথা?
আমি তো জানিনা।
সঙ্গে সঙ্গে-ব্রেক কসে গাড়ি থামিয়ে ফেলে নীলা, বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলে—তুমি জানোনা?

উঁ হুঁ......জানিনা।

মনির!

তখন গাড়িখানা এক নির্জন স্থানে এসে পড়েছিলো। পথের দু'পাশে বিস্তৃত প্রান্তর আর গমের ক্ষেত। মাঝে মাঝে ছোট ছোট টিলা আর ঝর্ণা ধারা।

নীলা নেমে পড়ে গাড়ি থেকে, অভিমানে এগিয়ে যায় সে গমের ক্ষেতের পাশ ধরে।

বনহুর মৃদু হাসে, অগত্যা সেও নেমে যায় গাড়ি থেকে। নীলা ততক্ষণে এগিয়ে গেছে কিছুদূর। বনহুর তার পিছনে না এগিয়ে একটা উচু টিলার উপর বসে পড়ে।

নীলা দূর থেকে একবার ফিরে তাকালো সেও বসে পড়লো একটা গাছের নিচে। অভিমানে নীলার দু'চোখে পানি এসে যাচ্ছিলো। ওর একটি কথা তাকে বড় আঘাত দিয়েছে আমি তো জানিনা......রংলাল তাকে এমন কথা বলতে পারলো!

নীলা অনেকক্ষণ বসে বসে প্রতিক্ষা করলো। আসলে রংলাল কিন্তু সে এলো না। নীলা উঠে এলো তার পাশে—মনির।

সরল সহজভাবে বনহুর উঠে দাঁড়ালো—আপামনি।

এসো যাই।

আপামনি এরি মধ্যে বেড়ানো হলো?

তোমাকে আর কোন দিন সঙ্গে আনবোনা।

কেনো?

এসো...নীলা এগিয়ে যায় গাড়িখানার দিকে।

বনহুর ওকে অনুসরণ করে।

গাড়িতে বসে আর কোন কথা হয় না তাদের মধ্যে।

আজ নীলাকে সর্বক্ষণের জন্য বিষণ্ন মনে হয়। গাড়ি থেকে নেমে নিজের ঘরে চলে গেলো সে।

সন্ধ্যা বেলা অন্যান্য দিনের মত বই নিয়ে হাজির হলো বনহুর নীলার ঘরে।

পদ শব্দে চোখ তুলে তাকালো, সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে নিলো নীলা।

বনহুর বুঝতে পারলো তার উপর নীলা অভিমান করেছে তাই মাথা নীচু করে একটু হাসলো তারপর সহজ গলায় বললো—আপামনি আজ পড়া বলে দেবেন না?

গম্ভীর কণ্ঠে বললো নীলা—না।

বনহুর ধীর পদক্ষেপে দরজার দিকে পা বাড়ালো নীলার অভিমানের কারণ সে জানে তাই তার মনে কোন রাগ হয়নি।

পিছু ডাকলো নীলা—শোন।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো বনহুর।

নীলা বললো—এদিকে এসো।

বনহুর এসে দাঁড়ালো নীলার সম্মুখে—আপামনি বললেন যে পড়াবেন না আর।

হাঁ। তুমি চলে যাও, আর তোমার কোন প্রয়োজন নেই।

বনহুর চমকে চোখ তুললো—চলে যাবো?

হাঁ আজ এই সন্ধ্যাবেলা এক্ষুণি চলে যাও।

আচ্ছা। বনহুর নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো।

নিজের ঘরে এসে মনে মনে হাসলো বনহুর। নীলার উপর বড় মায়া হলো, সরল সহজ মন একটি তরুণী। জানেনা—কাকে সে ভালবেসেছে। নিজের জামা কাপড়গুলো তার সুটকেসটার মধ্যে গুছিয়ে নিচ্ছিলো বনহুর।

এমন সময় কে যেন তার কাঁধে হাত রাখলো।

বনহুর ফিরে তাকালো।

নীলা তার কাঁধ থেকে হাতখানা সরিয়ে নিলো। দু'চোখে তার পানি ছল ছল করছে। ডাকলো সে—মনির তুমি সত্যি চলে যাচ্ছো?

হাঁ আপামনি।

কেনো—কেনো তুমি যাচ্ছো?

আপনি তো আমাকে যেতে বললেন।

না তোমার যাওয়া হবেনা।

সেকি আপামনি আপনি যে বললেন?

আমি বলছি তোমার যাওয়া হবেনা। এসো বই নিয়ে পড়বে এসো।

বনহুর মাথা নিচু করে একটু হাসে। অবশ্য সে হাসি নীলার নজরে পড়ে না।

নীলা বলে—এসো মনির।

এবার বনহুর বই হাতে তুলে নেয়।

নীলার পিছনে পিছনে এগিয়ে চলে বনহুর।

প্রতিদিনের মত নীলা চেয়ারে বসে আর বনহুর বসে তার পায়ের কাছে। বইখানা মেঝেতে মেলে বসে।

নীলা ওকে পড়া বলে দেয়।

বনহুর আজ সুন্দর করে পড়া উচ্চারণ করে।

নীলা খুশি হয়ে বলে যে—কাল এ বইখানা তোমার শেষ হলে তোমাকে একটা জিনিস পুরস্কার দেবো।

বনহুর খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো—আচ্ছা আপামনি আজ তাহলে ঘরে বসে পড়া মুখস্থ করিগে?

আচ্ছা যাও।

বনহুর বেরিয়ে যায়।

রাত বাড়ছে।

নীলা একটা বই পড়ছিলো।

বাবুর্চি টেবিলে খাবার দিয়ে বলে গেলো—আপামনি খাবার দিয়েছি।

আচ্ছা যাচ্ছি। নীলা বই রেখে সোজা হয়ে বললো বাবুর্চি—

বলুন আপামনি?

রংলাল খেয়েছে?

তার ঘরে খাবার দিয়েছি।

আচ্ছা যাও আসছি......

বাবুর্চি চলে যায়।

নীলা উঠে পড়ে, এগিয়ে যায় সে বনহুরের কক্ষের দিকে।

বনহুর সবেমাত্র খাবার খেতে শুরু করেছে।

এমন সময় নীলা এসে দাঁড়ায় পাশে—একি আবার তুমি হাত দিয়ে খাচ্ছ? কাঁটা চামচ হাতে নাও।

আপামনি আমি কাঁটা চামচে খেতে পারিনা।

হাতে নাও আমি তোমাকে শিখিয়ে দিচ্ছি......

বনহুর কাঁটা চামচ হাতে তুলে নেয়।

নীলা ওর পিছনে থেকে হাত দু'খানা ধরে দেখিয়ে দেয়—নাও এমনি করে খাও। খাও......

পারছিনা আপামনি।

পারবে। নিশ্চয়ই পারবে......নাও ধরো।

নীলা এমনি করে বনহুরকে কাঁটা চামচে খাওয়া শেখাতে থাকে।

বনহুরের খাওয়া শেষ হলে নীলা খেতে যায়।

বনহুর আপন মনে হাসে।

রাত-গভীর হয়ে আসছে।

নীলার মনে এক নতুন অনুভূতি। অভূতপূর্ব শিহরণ জাগে তার শিরায় শিরায়। এতো ভালো লাগে ওকে......নীলা বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবে ওর কথা।

মৃদু টোকা পড়ে দরজায়।

নীলার বুকটা আনন্দে টিপ টিপ করে উঠে। নিশ্চয়ই রংলাল এসেছে হয়তো কোন কথা বলতে। নীলা দরজা খুলে দিতেই জমদূতের মত জমকালো পোশাক পরা একজন প্রবেশ করলো নীলার পাশ কেটে কক্ষের ভিতরে।

নীলা কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেলো, বিবর্ণ হয়ে উঠেছে তার মুখমন্ডল।

জমকালো মূর্তি বললো—ভয় নেই আমি তোমার কোন ক্ষতি করবোনা। কারণ তোমার গলার হার ছড়া তুমি আমাকে দিয়েছো। নীলা একটা কথা তোমাকে জানাতে এলাম। আমি তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী।

নীলা অস্ফুট কণ্ঠে বললো—দস্যু বনহুর তুমি আমার মহামূল্যবান হীরক হার নিয়েছো আবার তুমি কেনো এলে?

বলেছি তোমার মঙ্গল্লের জন্যই এসেছি যেহেতু তুমি আমাকে উপযুক্ত উপহার দিয়েছো। শোন নীলা তুমি মহা ভুল করছো। রংলালকে তুমি যেভাবে নিজের করে নিতে চেষ্টা করছো তা কোনদিন মঙ্গলজনক নয়। আমি বার বার তোমাকে এ ব্যাপারে সাবধান করে দিচ্ছি.....

নীলার চোখে মুখে ভয় আর আতঙ্ক ছাড়াও একটা ক্রুদ্ধভাব ফুটে উঠলো, সে বললো—আমি এ ব্যাপারে কারো পরামর্শ চাইনা। আমি রংলালকে শুধু নিজের করে নিতেই চাইনা তাকে আমি নিজের করে নিয়েছি। কোনদিন তাকে আমি ছেড়ে দেবোনা। দস্যু বনহুর তুমি আরও যা চাইবে তাই দেবো তবু আমাকে তুমি এ ব্যাপারে সাবধান করতে এসোনা।

নীলা তুমি যদি ওকে ত্যাগ না করো তাহলে আমি ওকে হত্যা করবো। ওকে চিরদিনের জন্য তোমার কাছ থেকে সরিয়ে ফেলবো।

দস্যু! তুমি এতোবড় পাষন্ড! এতোবড় হৃদয়হীন। আমাকে দুঃখ ব্যথা দেওয়ার জন্য তুমি একটা নিষ্পাপ জীবন বিনষ্ট করতে চাও? কি অপরাধ আমি করেছি বলো? তাই ওকে তুমি আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে চাও? আমি তোমাকে ভয় করিনা, তুমি ওকে হত্যা করার পূর্বে আমাকে হত্যা করবে......নীলার দু'চোখে পানি ঝরে পড়ে। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে সে।

স্তব্ধ আড়ষ্ট হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে বনহুর। নীলার মুখখানা তার হৃদয়ে দারুনভাবে আঘাত করে। নিজেকে অতি কষ্টে সংযত করে বনহুর।

নীলা ছুটে যায়, দু'হাতে বনহুরের পা দু'খানা চেপে ধরে বলে—তুমি যা চাও আমি তাই দেবো দস্যু বনহুর। আমি তাই দেবো তবু রংলালকে তুমি হত্যা করোনা। ওর কোন দোষ নেই। কোন অপরাধ নেই—আমি তোমার পা ধরছি।

পা ছাড়ো নীলা।

না শপথ করো আমার রংলালকে তুমি হত্যা করবেনা? বলো কথা দাও।
হেসে উঠে বনহুর—দস্যুর আবার শপথ।
আমি বিশ্বাস করবো তোমার কথা।
নীলা।
হাঁ।
কিন্তু তা সম্ভব নয়।
কেনো। কেনো সম্ভব নয়?
পরে সব তুমি জানতে পারবে নীলা। তুমি রংলালকে ত্যাগ করো।
পারবোনা। বার বার তুমি আমাকে এ অনুরোধ করোনা দস্যু বনহুর। তোমাকে মহামূল্যবান হার দিয়েছি এই নাও আমার হাতের বলয় জোড়া তুমি নাও তবু আমার রংলালকে ছিনিয়ে নিওনা...
কিন্তু তুমি ভুল করছো নীলা।
নাও তবু তুমি যাও। যাও দস্যু বনহুর......
বনহুর নীলার হাত-থেকে বলয় জেড়ো নিয়ে পকেটে রাখলো। তারপর বললো—বেশ আমি যাচ্ছি আবার দেখা হবে।
বেরিয়ে গেলো বনহুর।
নীলার শরীর যেন হীম ঠান্ডা হয়ে উঠেছে। তার ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটেছে।
বনহুর বেরিয়ে যাবার কয়েক মিনিট পর নীলা নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে অতি সন্তর্পণে সিড়ি বেয়ে নেমে আসে নিচে। রংলালের কক্ষে প্রবেশ করে এগিয়ে যায় সে—তার বিছানার দিকে। আলগোছে সরিয়ে ফেলে নীলা তার মুখের কম্বল খানা।
অঘোরে ঘুমাচ্ছে রংলাল।
কক্ষের নীলাভ আলোয় রংলালের ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো নীলা নিষ্পলক নয়নে। গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে ফোটা ফোটা অশ্রু......